সাম্যবাদের গোড়ার কথা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
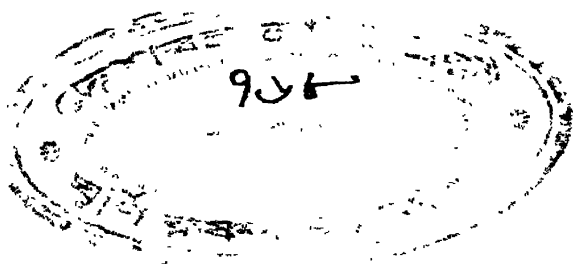
১৩৪০

আত্মশক্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা।

প্রকাশক—মন্মথনাথ বিশ্বাস
আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ক্লাসিক প্রেস
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত:
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

শ্রীমান রমণীমোহন গোস্বামী

ও

শ্রীমান অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

নিবেদন

'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল। ইতিপূর্ব্বে 'যুগশঙ্খে' ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের কয়েকটি অংশ পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি এখন এই পুস্তকের সহিত সংযুক্ত হ'ল। বার্ণার্ড শয়ের Intelligent Woman's Guide to Socialism একখানা উৎকৃষ্ট বই। এই পুস্তককেই ভিত্তি ক'রে 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' রচিত হয়েছে। অনেকপূর্ব্বে ক্রোপটকিনের 'Conquest of Bread' পাঠ করেছিলাম। ঐ পুস্তক আমার সম্মুখে একটা নূতন জগৎ খু'লে দেয়। ক্রোপটকিন প'ড়ে আমি বুঝতে পারি, সাম্যবাদের ভিত্তি ভাববিলাসীর কল্পনার উপরে নহে, চিরন্তন সত্যের উপরে। বার্ণার্ড শ এই ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে।

যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পাচ্ছি, মানুষকে যতক্ষণ তার অধিকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন করতে না পাচ্ছি ততক্ষণ তার শৃঙ্খল ঘুচবার নয়। মানুষকে শক্তিমান ও সাহসী করতে হলে তাকে জ্ঞান দিতে হবে। The

Suprme task of the moment is political education, Wellsএর এই কথায় আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসই আমাকে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী করেছে। দেশে যদি আমরা সতেজ সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারি—সতেজ মনেরও সৃষ্টি করতে পারব।

জগতে সব মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে। বাঁচবার অধিকার বললে সবটুকু বলা হ'ল না। রাস্তার ফুটপাথে নিরাশ্রয় মানুষ রাত্রিযাপন করে। আধপেটা খেয়ে লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত নরনারী রাস্তায় রাস্তায় জানোয়ারের মত ঘু'রে বেড়ায়, মায়ের কোলে শিশুসন্তান হাজারে হাজারে দুধের জন্য কাঁদে, কাজের অভাবে, দারিদ্র্যের তাড়নায় মেয়েরা লম্পটের কাছে দেহ বিকায়। তারাও তো বাঁচে। কিন্তু এমনি ক'রে অপমানের মধ্যে, অনটনের মধ্যে, অকল্যাণের মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। তাই শুধু বাঁচবার অধিকার নয়, মানুষের মত বাঁচতে গেলে মঙ্গলের মধ্যে বাঁচবার অধিকার চাই। আনন্দের মধ্যে বাঁচব, প্রেমের মধ্যে বাঁচব, সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাঁচব, শক্তির মধ্যে বাঁচব সত্যের মধ্যে বাঁচব, জ্ঞানের মধ্যে বাঁচব। বিশ্বের

সম্পদসৃষ্টির কাজে যারাই ব্রতী তাদেরই অধিকার আছে কল্যাণের মধ্যে বাঁচবার।

সামাজিক পরিবর্ত্তন কামনার মূলে রয়েছে এই বাঁচার অধিকারের দাবী। সমাজের আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য চাই সর্ব্বাগ্রে অন্ন। কার্য্যক্ষম শ্রমিকের দল বেকার অবস্থায় ঘু'রে বেড়ায়—কাজ দেবার লোক নেই; কর্ম্মের অভাবে অলস বাহু ব্যর্থতার কান্না নিয়ে অসহায়ভাবে দোলে; রাতের বেলায় নারী আর শিশুরা পথে পথে বেড়ায়, মাথা গুঁজবার ছাদ নেই। লক্ষ লক্ষ পরিবার রয়েছে যাদের সম্বল শুধু নুণ আর ভাত। পুরুষ, নারী, শিশু অন্নের অভাবে মরে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তনের হাওয়া এসেছে।

কিন্তু এই হাওয়ার প্রয়োজন কি শুধু অন্নের জন্যই? শুধু প্রাণধারণের জন্য যাদের অবিরাম সংগ্রাম করতে হয় তারা জীবনের অনেক-কিছু উচ্চতর ধরণের আনন্দের সন্ধান পায় না। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে মানুষ যে আনন্দ পায়, ছবি আঁকার মধ্যে, সাহিত্য-রচনার মধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনের প্রেরণা যে পরিতৃপ্তি লাভ করে—সেই আনন্দ জীবনকে বহুগুণে সম্পদশালী করে—সেই সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে

থাকা পরম দুর্ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই। আজকাল এই উচ্চতর আনন্দ মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একে আমরা সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। তার জন্য চাই অবকাশ—সুপ্রচুর অবকাশ। রুটি তো শুধু রুটির জন্য নয়। Man cannot live by bread alone. রুটির অভাব যতক্ষণ না মিটছে, ক্ষুধার জ্বালা যতক্ষণ না ঘুচ্‌ছে ততক্ষণ মানুষের কাছে সাহিত্য বিজ্ঞানের কোন অর্থ থাকে না; তার চিত্ত উচ্চতর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে না। তাই শুধু রুটির দাবী নয়, সুপ্রচুর অবকাশের দাবীও চাই—কারণ অবকাশের মধ্যে মানুষ আপনার অন্তর্নিহিত সৃষ্টির প্রেরণাকে সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে রূপ দান করেছে—প্রকৃতির রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয়েছে। After bread has been secured, leisure is the supreme aim.

চাষীদের দুঃখ অবর্ণনীয়; তাদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। প্রায় সকল চাষীরই কিছু-না-কিছু দেনা আছে। সে দেনা কোন দিন যে তারা পরিশোধ করতে পারবে—এমন আশা নিতান্তই দুরাশা। যেখানে জমিদার চাষীকে লুণ্ঠন করে না—সেখানে রাষ্ট্র করে। যেখানে রাষ্ট্রের

যোয়াল হালকা সেখানে সুদখোর মহাজন তাকে পথে বসাবার আয়োজন করছে। রাষ্ট্রের টেক্স, জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের সুদ দিতে দিতে চাষীরা সর্ব্বাস্বান্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

চাষী মজুর যখন বুঝতে পারবে তাদের প্রয়োজন কি কি এবং সেই সকল প্রয়োজন মেটাবার পন্থাই বা কোথায়, যখন তারা জানবে, বিজ্ঞান এবং সমবেত শক্তির সাহায্যে অতি অল্প পরিশ্রমে ধরণীর গর্ভ থেকে প্রয়োজনীয় শস্য-সম্ভার আদায় করা কত সহজ তখন চিত্তদৌর্ব্বল্য আপনা-থেকে ঘু'চে যাবে।

কিন্তু সামাজিক অবস্থার ও আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন চাই সকলের আগে। সেই পরিবর্ত্তন যতক্ষণ না আনতে পারছি, আয়ের বৈষম্য যতদিন না ঘুচবে ততদিন মানুষের দুঃখ ত' ঘুচবার নয়। এই দুঃখ থেকে মুক্তির সাধনা চলেছে আজ দিকে দিকে। সে সাধনা কতদিনে জয়ী হবে তা আমরা জানি না। যতদিনেই জয়ী হোক, হাল ছাড়লে চলবে না। রাত্রির তপস্যা অন্ধকারের গর্ভ থেকে প্রভাতের অরুণজ্যোতি একদিন জাগিয়ে তুলবেই।

কৃষ্ণনগর
৬.১০-৫২

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সাম্যবাদের গোড়ার কথা

১

উপার্জ্জনের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে যথেষ্ট বৈষম্য আছে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মাসে দুই হাজার টাকা বেতন পায়; তার আরদালি পায় মাসে পনেরো টাকা বেতন। একজন অধ্যাপকের মাসিক আয় পাঁচশত টাকা; একজন ইস্কুল-মাষ্টারের আয় মাসে পঞ্চাশ টাকা। সমাজে এক-জনের আয়ের সঙ্গে আর-একজনের আয়ের এই যে বৈষম্য র'য়েছে—এই বৈষম্যকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি নে। ধনগত এই বৈষম্য আমাদের সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান, আমাদের ইস্কুল কলেজ, সংবাদপত্র, ধর্ম্মমন্দির সব-কিছুকে কলুষিত ক'রে তুল্‌ছে।

অর্থনীতির কথা তুললেই অনেকের শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। মনে করে, ঐ রাজ্যটা কেবল হোমরা-চোমরা পণ্ডিতদের জন্য; জনসাধারণের সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু আসলে অর্থনীতির ব্যাপারটা একেবারেই জটিল নয়। আমরা সকলেই নিজের নিজের পরিবারের আয়-ব্যয়ের ব্যাপার নিজেরাই নির্ব্বাহ ক'রে থাকি। বাড়ীর কর্ত্তা রোজগার ক'রে থাকেন; গৃহিণী সকল দিক সামলিয়ে তাই ব্যয় করেন। বাড়ী সম্বন্ধে যা খাটে দেশ সম্বন্ধেও তাই খাটে। বাড়ীর যেমন একটা আয় আছে জাতিরও তেমনি একটা আয় আছে, বাড়ীর গৃহিণী যেমন আয়ের টাকা থেকে খরচ করেন, জাতিকেও তেমনি আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়। সমস্যা হচ্ছে, আয়ের টাকা কেমন ক'রে খরচ করলে জাতির অধিকাংশ লোককে সুখী ক'রতে পারা যায়।

সংসার ভালো ক'রে চালাতে পারে সেই গৃহিণী যে জানে কোন্ কোন্ দ্রব্য আগে কেনার প্রয়োজন, সংসারে কোন জিনিষের অভাব সকলের চেয়ে বেশী। ঘরে চাল বাড়ন্ত অথচ যে গৃহিণী চাল না কিনে রেশমের সাড়ী কিনে টাকা খরচ ক'রে ফেলে অথবা ব্রেস্‌লেট গড়িয়ে স্যাকরার সিন্ধুকে টাকা দেয় তাকে লোকে বলে

নির্ব্বোধ; তার দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদে। সংসারে সকলের আগে প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের, রেশমের সাড়ী আর ব্রেস্‌লেটের প্রয়োজন পরে। এই জ্ঞান যে গৃহিণীর নেই তার কাশীবাস করাই ভালো। যে ছেলের গায়ে কাপড় নেই—ক্ষুধায় যে কাতর তাকে ভাত আর কাপড় না দিয়ে যদি একখানি রামায়ণ কিনে দিই, লোকে আমাকে পাগল ব'লবে। সংসারে রেশমের সাড়ী, ব্রেস্‌লেট অথবা রামায়ণের যে দরকার নেই এমন নয়—কিন্তু সকলের আগে দরকার ভাতের। Food comes first.

দেশটাকে ধ'রে নেওয়া যাক একটা বিরাট বাড়ী আর জাতিটাকে ধ'রে নেওয়া যাক একটা বিপুল পরিবার। চারিদিকে কি দেখতে পাই? পথে পথে, ঘরে ঘরে দরিদ্র নরনারীর দল যারা পেট ভ'রে খেতে পায় না, ক্ষুধায় যারা ছট্‌ফট্‌ করে, যারা কাপড়ের অভাবে শীতে কাঁপে, যে ঘরে আলো নেই, বাতাস নেই সেখানে শুয়োরের মত গাদাগাদি ক'রে শুয়ে থাকে—যারা পশুর মত বাঁচে, পশুর মত মরে। এই সব হতভাগ্য নরনারীর ভাত-কাপড়ের খরচ যোগাবার জন্য যে টাকা ব্যয় করবার প্রয়োজন আছে—সেই টাকা জলের মত ব্যয়িত হচ্ছে

শিগার, শ্যাম্পেন আর মোটর গাড়ীর পিছনে। মানুষের পেটে ভাত নেই—সোনার গয়না. সিল্কের পাঞ্জাবি, সাবান, এসেন্স আর রসগোল্লার জন্য কত যে টাকা ব্যয় হচ্ছে তার সংখ্যা নেই। একজনের পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, পায়ে জুতো নেই, আর-একজনের বাক্সভরা কাপড়, দশবারো জোড়া জুতো। বাচ্চা ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত ক'রে মারছে—ওদিকে জমিদারের পুত্র হোটেলে চপ ডেভিল আর মুরগীর রোষ্টের পিছনে দিনের পর দিন জলের মত টাকা ব্যয় করছে। অতিরিক্ত খাওয়ার জন্য শেষে ডাক্তার ডাক্‌তে হচ্ছে।

অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এর চেয়ে পাগলামি আর নেই। এই বৈষম্যের সমর্থন করে—এমন নির্ব্বোধ লোকেরও অভাব নেই। তারা বলে, যেহেতু রামের বাবা চা-বাগানের এবং শ্যামের ঠাকুরদাদা সাহেব-কোম্পানীর নায়েবী ক'রে অনেক-টাকা জমিয়ে গেছেন সেই হেতু রাম ও শ্যাম যথেচ্ছভাবে টাকা খরচ করতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, যে জাতি ছেলেদের দুধ যোগাবার আগে মদের পিছনে টাকা ব্যয় করে, লক্ষ লক্ষ শিশু ঔষধের অভাবে অন্নের অভাবে মারা যাচ্ছে সে দিকে খেয়াল না রেখে ঘোড়াকে দানা

আর কুকুরকে মাংস খাওয়ায়, মোটরের পেট্রলের পিছনে অজস্র টাকা ব্যয় করে সে জাতি নির্ব্বোধ পাগল জাতি, সে জাতির পরিণাম ধ্বংস। নিজের কতগুলি গয়না এবং কতগুলি ঘর আছে এই গুণে যারা জাতির সম্পদের পরিমাণ করতে যায় তারা বোকা। সেই জাতিই প্রকৃত পক্ষে সম্পদশালী যে-জাতি জানে কোন্ জিনিষের প্রয়োজন সকলের আগে এবং সেই প্রয়োজন বুঝে খরচ করে। যতক্ষণ প্রত্যেক নর-নারীর ভাত-কাপড় এবং বাসস্থানের অভাব না ঘুচে ততক্ষণ কোন মানুষের বিলাসিতার জন্য অর্থ ব্যয় করবার অধিকার নেই—এই সত্য যে জাতি বুঝেছে সেই জাতিই কল্যাণকে লাভ করে।

যতক্ষণ একজন মানুষের আয় বেশী এবং আর একজন মানুষের আয় কম থাকবে ততক্ষণ এই রকম বৈষম্য থাকবেই। গরীব ভাত-কাপড় কেনার জন্য সব টাকা খরচ করবে কিন্তু তবুও তার অভাব মিটবে না; সে বলবে আরও ভাত, আরও কাপড় চাই। পক্ষান্তরে ভাত কাপড় কিনেও ধনীর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই টাকা দিয়ে সে হীরের গয়না গড়ায়, মোটর কেনে, রাইফেল কেনে। গরীবের টাকা নেই। তার জন্য কে আর বাড়ী তৈরী করবে? ধনীর টাকা আছে। সেই টাকার দ্বারা সে

গরীব মানুষকে দিয়ে আফ্রিকার খনি থেকে সোণা তোলাচ্ছে, কারখানায় মোটর গাড়ী গড়াচ্ছে। গরীব যে বাড়ীর জন্য কাঁদছে রুটির জন্য কাঁদছে সেই বাড়ী ও রুটির জন্য টাকা খরচ করবার সে প্রয়োজনই অনুভব করে না।

অনেকে বলে, ধনীরা মোটর গড়াচ্ছে তাই কত গরীব কাজ পাচ্ছে। নইলে কাজের অভাবে না খেয়ে মরে যেত। যে খুন করে সে-ও যে ফাঁসি দেয় তাকে কাজ দিচ্ছে ; যে মানুষকে মোটর চাপা দিচ্ছে সে-ও ডাক্তারকে আর হাসপাতালের নার্সকে কাজ দিচ্ছে। কাজ দেওয়া-টাই কি বড় কথা ? ঘরে যে আগুন লাগায় সে কি দম-কলের কর্ম্মচারীদের কাজ দেয় না ?

যত গণ্ডগোল এই আয়ের বৈষম্য নিয়ে। একজনের বেশী টাকা, আর একজনের কম টাকা ; তাইত যার বেশী টাকা সে গরীবকে দিয়ে যা খুসী তাই বানিয়ে নিচ্ছে। যদি সকলের টাকা সমান হ'ত তবে কেউ অলস পরগাছাদের সেবা করত না ; প্রত্যেকে যতদিন ভাত-কাপড় আর বাড়ী না পেত ততদিন একজন মানুষ টাকার জোরে আর-একজনকে দিয়ে মোটরগাড়ী অথবা এসেন্স তৈরী করাতে পারত না। আড়ম্বর, আলস্য

এবং অমিতব্যয়িতা তা হ'লে ক'মে যেত ; ভাত, কাপড়. বাড়ী ও স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল হ'ত। দেশের চেহারা ফিরে যেত।

২

অনেকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন, সাধারণ লোকের আয় বেশী হ'লে তারা কি এখনকার চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকবে ? একথা শুনলেই যে ইচ্ছাটি মনের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে জাগে তা হচ্ছে প্রশ্নকারীর পৃষ্ঠদেশে বিরিশী দশ আনা ওজনের একটা কীল বসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। যে পরিবার পেট ভ'রে খেতে পায়, ভালো ঘরে থাকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে, আচার-ব্যবহারে ভদ্র সে পরিবার ভালো না হ'য়ে যদি ভালো হয় এমন পরিবার যাদের ঘরে নেই চাল, পরিধানে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, মেজে স্যাঁতসেতে—তবে ভাল কথাটার কোন মানেই থাকেনা।

অবশ্য ভালো খেলে আর ভালো পরলেই মানুষ যে সব সময় ভালো হয় এমন কথা নয়। এমন মেয়ের অভাব নেই যাদের গা-ভরা গয়না কিন্তু অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, যাদের মনের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ ময়লা। এমন পুরুষেরও অভাব নেই যাদের প্রত্যেক আঙুলে সোনার আর হীরার আঙটী কিন্তু যারা অলস

আর মূর্খ; যাদের টাকা আছে কিন্তু হৃদয় নেই, চরিত্র নেই, নূতন কিছু অথবা প্রয়োজনীয় কিছু গড়বার ক্ষমতা নেই। সুতরাং টাকা বাড়লেই মানুষ ভালো হবে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত। এবার দেখা যাক্ আয় যদি সকলের সমান হয় তবে মানুষ হিসাবে আমাদের মূল্য বাড়বে না কমবে ?

কেউ কেউ ব'লে থাকেন—ভালো মানুষ সৃষ্টি ক'রতে হ'লে বাছাই ক'রে ভালো মেয়ের সঙ্গে ভালো ছেলের বিবাহ ঘটিয়ে দিতে হবে। এবিষয়ে তাঁরা পশু জগতের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষের পক্ষে বাধা দুইটী। প্রথমতঃ পশুর বেলায় পছন্দের কোন সমস্যা নেই কিন্তু মানুষের পছন্দ ব'লে একটা জিনিষ আছে। দ্বিতীয়তঃ ঠিক কি রকম মানুষ আমরা চাই একথাও বলা বড় শক্ত। ঘোড়ার বেলায় বুঝি দ্রুতগামী ঘোড়া চাই অথবা এমন ঘোড়া চাই যে খুব ভারী বোঝা বহন ক'রতে পারে। কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক কি রকমের মানুষ চাই সেকথা বলা একেবারেই সহজ নয়।

নিজেকে যদি প্রশ্ন কর—কেমন ছেলে-মেয়ে চাও—তবে তার উত্তর পাওয়া কঠিন। অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন অথবা পাগল ছেলে মেয়ে চাই না—এই পর্য্যন্ত বলা চলে। কেমন

ছেলে চাও, এর উত্তরে শুধু ব'লতে পারো ভালো ছেলে চাই। কিন্তু ভালো ছেলের মাপ-কাঠি কি? ভাল ছেলে এমন কিছু করে না যাতে বাপ-মা মনে কষ্ট পায়। কিন্তু যে সব ছেলের সাহস আছে, উত্তম আছে, প্রতিভা আছে তারা শৈশবে একটু দুরন্ত হয়ে থাকে; বাল্যে বাপ-মাকে তারা কম কষ্ট দেয় না। শচীর দুলাল কি শচী-মাকে ছেলে বেলায় কম জ্বালিয়েছে! আমাদের ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও ছেলে বেলায় শান্ত ও সাধু ব'লে একটুও খ্যাতি ছিলনা। তারপর, যে সব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী প্রতিভা-সম্পন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁদের ভাগ্যেও প্রশংসার মাল্য-চন্দন কদাচিত জুটে থাকে। আমরা সক্রেটিসকে বিষ খাইয়ে মেরেচি, যীশুখৃষ্টকে ক্রশ-কাঠে পেরেক ঠুকে ঠুকে পরলোকে পাঠিয়েচি, জোয়ান-অফ-আর্ককে আগুনে পুড়িয়ে মারতে সঙ্কোচ বোধ করিনি। তাঁরা মানুষের সমাজে বাস করবার যোগ্য নন এই মনে ক'রেই আমরা তাঁদের মেরেচি। এর পরেও আমরা যদি বলি, কোন্ মানুষ ভালো আর কোন্ মানুষ মন্দ তা বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের আছে—তবে কি সেটা বিদ্রূপের মত শোনায় না?

ভালো জাতি সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রী বাছবার

ভার যদি আমরা রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দিতে রাজী হই, রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে তা হ'লে মহা ফাঁপরে পড়তে হবে। তারা এই পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে ঠিক করতে পারে—যাদের যক্ষা অথবা কুৎসিত ব্যাধি আছে, যারা পাগল অথবা মাতাল তাদের আইনের দ্বারা বিবাহ ক'রতে দেওয়া হবে না—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। তারপর চরিত্রের মহত্ত্বের দিক দিয়ে যদি মানুষ বাছাই করতে হয় তবে লোকে চৈতন্য, শিবাজী, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, সিজার, নেপোলিয়ান—কাকে আদর্শ বলে গ্রহণ ক'রবে? সমস্যা শুধু এখানে নয়। সংসারে সর্ব্বপ্রকারের মানুষ চাই। কোন ছাঁচের মানুষ কতগুলি চাই এবং সেই বুঝে নরনারীর ব্যবস্থা করা—শুনতে বেশ মজা লাগে কিন্তু করা সম্ভবপর নয়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে বিবাহ ব্যাপারটাকে নরনারীর নিজের নিজের পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ বিষয়ে প্রকৃতি যা করে তাই ভাল।

কিন্তু তাই কি আমরা করি না? মোটেই না। জীবনে নিজের নিজের সাথী বাছবার ভার আমাদের নিজেদের হাতে কতখানি আছে? যখন একজন মেয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই একজন ছেলেকে ভালবেসে ফেলে তখন

প্রকৃতিই সেই শুভদৃষ্টি ঘটিয়ে দেয়—প্রকৃতিই তখন মেয়েকে বলে দেয়, সেই ছেলেই তার জীবনের যোগ্যতম সঙ্গী। কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশকে মানুষ মানে কই ? মেয়ের বাবার টাকার অনুপাতে যদি ছেলের টাকা না থাকে তবে সেখানে ছেলে-মেয়ের বিবাহ অসম্ভব।

যেখানে ছেলে মেয়েকে অথবা মেয়ে ছেলেকে প্রেমের জন্য নয়, টাকার জন্য অথবা পদমর্য্যাদার জন্য বিবাহ ক'রতে বাধ্য হয়—সেখানে এমন-কিছু করা হয় যা সমস্ত স্বভাবের বিরোধী। বাড়ীতে বাড়ীতে যে এত অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অনেক জায়গায় মিল নেই, ছেলে-মেয়েগুলো যে দেখতে এত কুৎসিত হয় তার কারণ কি ? প্রকৃতির ইঙ্গিতকে অস্বীকার। আমাদের বিবাহে স্বভাবের কোন হাত নেই—বর-কনের পছন্দ অথবা অপছন্দের কোন সমস্যা নেই। আগে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল। বহু দেশের জ্ঞানী, গুণী, বীরেরা সেই সভায় আসতেন। মেয়ে তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ ক'রত তাকে বেছে নিত, যাকে পছন্দ ক'রত না তাকে গ্রহণও ক'রত না। সেই ভালবাসার বিবাহ থেকে যারা জন্মাত তারা কর্ণের মত, অর্জ্জুনের মত এক একজন দিকপাল হ'ত। রাজ্যহীন রাজার পুত্র সত্যবানকে রাজকুমারী

সাবিত্রী নিজেই বেছে নিয়েছিল স্বভাবের নির্দ্দেশে; ভালবেসেই দময়ন্তী নলের গলায় মালা দিয়েছিল। আমরা অনেক ব্যাপারে পুরাতনের দোহাই দিতে ছাড়িনা —কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে হই নির্ম্মম চামার ও কষাই; সেখানে ভালবাসাকে মর্য্যাদা দান করি না—মর্য্যাদা দিই কাঞ্চনকে,—যে বেশী টাকা দিতে পারে তার কাছে ছেলে বিক্রয় করি।

সমাজে যতদিন এই ব্যবস্থা থাকবে ততদিন ভালো জাতির সৃষ্টি অসম্ভব। আর এই সামাজিক ব্যবস্থার জন্য আয়ের বৈষম্যই দায়ী। একজন জমিদারের ছেলে একজন দরিদ্র প্রজার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না; একজন জজের মেয়ে একজন কেরানীর ছেলেকে বিয়ে করতে পায় না। কেন? কারণ উভয়ের মধ্যে আচার ও ব্যবহার-গত অনেক পার্থক্য আছে। আয়ের পার্থক্যের জন্যই মানুষের আচারে ও ব্যবহারে পার্থক্য ঘটে। আয় যদি সকলের সমান হ'ত তবে টাকা কম-বেশীর জন্য বিবাহে কোন অন্তরায় ঘটত না। সকলের যখন সমান টাকা, বিবাহ ক'রে কেউ লাভবান হ'ত না, ক্ষতি-গ্রস্তও হ'ত না,—গরীব ব'লে মেয়ে ছেলেকে প্রত্যা-খ্যান ক'রত না—মেয়ে গরীব ব'লে ছেলেও তাকে

প্রত্যাখ্যান করবার হেতু খুঁজে পেত না। প্রেম হ'ত নরনারীর মধ্যে মিলনের একমাত্র যোগসূত্র। তা হ'লে হৃদয় নিয়ে এত কান্নাকাটি হ'ত না—জগতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিচ্ছেদের বেদনাও এমন ঘনিয়ে উঠত না —যে যাকে পছন্দ করত, সেই তার গলায় মালা পরিয়ে দিত।

৩

যাদের আয় কম তাদের ভাগ্যে রাজদ্বারেও সুবিচার জুটে না। অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। কবির 'দুই বিঘা জমি' কল্পনা নয়, সত্য। যার অনেক আছে সে আরও বেশী চায়; 'ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' বিচারের আশায় কাঙাল দাঁড়াবে কার কাছে? প্রথমতঃ আইনের ব্যাপার বড়ই জটিল; সেই জটিল রাজ্যে সাধারণ লোকের প্রবেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারপর হাকিমের কাছে সকল কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা সব লোকের থাকে না। সুতরাং সাধারণ গরীব লোকের পক্ষে উকিলের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যার পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, সে উকিলের মোটা ফী যোগাবে কোথা থেকে? বড় লোকের টাকার

অভাব নেই; তাই উকিল-ব্যারিষ্টার তার হাতের মুঠার মধ্যে। ধনীর অন্যায় দাবী না মিটিয়ে গরীব যাবে কোথায়? একটু অসম্মতির ভাব দেখ্‌লেই ধনী তৎক্ষণাৎ আদালতের ভয় দেখায়। অত্যাচারী প্রবল জমিদার জোর জুলুমের আশ্রয় নিয়ে গরীব প্রজার বিষয় সম্পত্তি দখল ক'রে নিচ্ছে—এ ত' নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রজা যখন প্রতিবাদ করে—জমিদার বলে, গবর্ণমেণ্টের আদালত আছে, যা ইচ্ছে করতে পার। জমিদার যখন এই কথা বলে তখন মনে মনে বেশ জানে, প্রজাকে হার মানতেই হবে—কারণ, আদালতে লড়াই ক'রতে হ'লে যে টাকার প্রয়োজন, তা তার নেই।

ফৌজদারী মোকর্দ্দমাতেও যার টাকা নেই সে বেচারার পক্ষে সুবিচার পাওয়া কঠিন সমস্যা। বড় লোক লাঠিয়াল দিয়ে মানুষ খুন করে, বরকন্দাজ দিয়ে ঘর পোড়ায়, পেয়াদা পাঠিয়ে কাছারি বাড়ীতে ধরে নিয়ে এসে গরীবকে জুতোপেটা করে, পুলিশ ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষ নিয়ে মোকর্দ্দমা রুজু করে বটে কিন্তু বড় লোকের অর্থস্রোতে ঐরাবতের মত ভেসে যায়। ধনী টাকার জোরে বড় বড় ব্যারিষ্টার নিয়ে আসে, মোটা ঘুষ দিয়ে সাক্ষীদের বশ করে, মিথ্যেকে সত্যি ক'রে সাজায় এবং শেষ

পর্য্যন্ত মুক্তি পায়। এমন কত লোক র'য়েছে যারা খুন ক'রেও দিব্যি আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে; টাকা না থাকলে তারা এতদিন ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌ত, আন্দামানে পচত। আবার এমন লোকেরও অভাব নেই যারা কোন অপরাধ না ক'রেও জেলখানায় বন্দী হ'য়ে আছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তাদের দারিদ্র্য; আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত ক'রবার মত তাদের টাকা ছিল না; দু চারশ' টাকা খরচ ক'রতে পারলে তারা জেলের বাইরে দিব্যি আরামে ঘুরে বেড়াতে পার'ত!

তারপর আইন নিজেই ত' স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কলুষিত, কারণ কাউন্সিলে যারা আইন তৈরী করে তারা বড় লোক। গরীব লোক যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদের জন্য দাঁড়াতে পারে না এমন নয়; সে অধিকার তাদের আছে। কিন্তু অধিকার থাক্‌লে কি হয়? সদস্যপদপ্রার্থীকে প্রথমেই দুই শত টাকা জমা দিতে হয়। এত টাকা জমা দেওয়ার মত গরীবের সামর্থ্য কোথায়? তারপর নির্ব্বাচন যুদ্ধে বিপক্ষকে পরাজিত ক'রতে হ'লে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার জন্যও কম টাকার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য দেখা যায়, দেশের শতকরা নব্বুই জন লোক যদিও দরিদ্র কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায়

যারা তাদের প্রতিনিধি হ'য়ে যায় তাদের মধ্যে গরীবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প; অধিকাংশই বড়লোক। প্রতি-নিধিরা যে সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে গরীবের সত্যিকারের অধিকারের কথা কমই থাকে।

যারা ধনী তারা অনেক রকমের অন্যায় এবং অনিষ্টকর অধিকারের দাবী ক'রে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে যা অন্যায় এবং অনিষ্টকর তা হচ্ছে—খাটব না, পরিশ্রম ক'রব না, অথচ পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি আরামে ব'সে ব'সে খাব—এই সর্ব্বনেশে অধিকারের দাবী। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনীরা এই অধিকার এমন ভাবেই প্রতি-ষ্ঠিত ক'রেছে যে গতর না খাটিয়ে যার খাওয়ার সামর্থ্য আছে তাকে আমরা সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকি। জমি-দার বাবু বাহিরের ঘরে ফরাসের উপর নধরকান্তি বপু নিয়ে দিব্যি আরামে তামাক টানছেন আর মোসাহেবদের সঙ্গে গল্প ক'রছেন; হাত দুখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ধূলা-মাটির দাগ নেই; সাধারণ লোক স্বভাবতঃই মনে করে এরাই ত' ভগবানের বরপুত্র; মাঠে বৃষ্টিতে লাঙল দিতে হয় না; রৌদ্রে ব'সে ছাদ পিটতে হয় না; করাত দিয়ে কাঠ চিরতে হয় না; ইস্কুলে ব'সে ছেলে পড়াতে হয় না; খবরের কাগজের আফিসে ব'সে প্রবন্ধ

লিখতে হয় না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিকেটীং ক'রতে হয় না। দিব্যি খাও দাও, স্ফূর্ত্তি কর, দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে যাও, সিনেমা দেখ। কিন্তু একথা আমরা কখনও কি ভেবে দেখেছি, যারা অন্যের সেবা গ্রহণ করে অর্থাৎ যারা চাষীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উৎপন্ন ভাত খায়, তাঁতির পরিশ্রমে তৈরী কাপড় পরে, মুচির পরিশ্রমে তৈরী জুতা পায়ে দেয়, রাজমিস্ত্রীর পরিশ্রমে তৈরী বাড়ীতে বাস করে কিন্তু সমাজের সেবাগ্রহণের পরিবর্ত্তে সমাজকে কিছু দান করে না, যারা শুধু ভোগ করে কিন্তু কোন জিনিষ উৎপন্ন করে না তারা সমাজের ঠিক ততখানি ক্ষতি করে যতখানি ক্ষতি করে চোর? সমাজের সেবা গ্রহণ করে অথচ সমাজের সেবার জন্য যে কর্ম্ম করে না গীতা তাকে ব'লেছে—স্তেনঃ এব সঃ। সে চোর।

যেহেতু একজন লোকের ব্যাঙ্কে বহু টাকা আছে সেই হেতু তার ইচ্ছামত লোক খুন ক'রবার অথবা অন্যের ঘরে আগুন দেবার অধিকার আছে এরকম কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে মানুষ খাটবে না, কেবল বসে বসে খাবে, যে কিছু দেবে না, কেবল নেবে, তার অন্যায় আমরা দিব্যি সহ্য

ক'রে চ'লেছি। খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ইত্যাদি অপরাধ দশ বৎসরে সমাজের যত না ক্ষতি করে পরোপজীবী পরগাছা জাতীয় অলস ধনীরা কিন্তু এক বৎসরে তার চেয়ে সমাজকে ঢের বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। ব্যবস্থাপক সভা অথবা পার্লামেণ্টে ধনীদের সংখ্যা বেশী, তাই তারা ঘরে সিঁদকাটা, জালিয়াতি, পকেটমারা, ইত্যাদি ধরণের চৌর্য্যের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে; কিন্তু কোন সম্পদ সৃষ্টি না ক'রে কেবল ভোগ ক'রে যাবার মধ্যে যে চৌর্য্য রয়েছে,সেই চৌর্য্যের শাস্তির কোন ব্যবস্থা নেই। বরং তারা অলস ধনীদের চুরির জীবনকে সম্মানের জীবন ব'লে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ক'রেছে, তারা আমাদের ছেলে মেয়েদের শেখাচ্ছে, জীবনধারণের জন্য শরীরকে খাটান অপমান ও লজ্জার বিষয়।

আমরা যেমন মৌমাছির মৌচাককে লুণ্ঠন ক'রে মধু খাই, অলস ধনীরা ত তেমনি ক'রেই গরীবের পরিশ্রমের সামগ্রী লুট ক'রে খাচ্ছে অথচ যারা প্রতিদিন দস্যুর মত লুটে খাচ্ছে তারাই হচ্ছে আমাদের সমাজে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। আর যারা পরিশ্রমের দ্বারা পাষাণ অহল্যার মত অনুর্ব্বর জমিকে ফলে শস্যে ভরিয়ে তুলছে,

যারা পাথর ভেঙ্গে পথ গড়ছে, পৃথিবীর সব কিছু সম্পদ সৃষ্টি করছে তারা আমাদের সমাজে ছোটলোক। তাদের পক্ষে পান্তাভাত আর নুণই যথেষ্ট, তাদের ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজে পড়ার দরকার নেই। ছোটলোকের আবার এত কেন বাপু? তারা গোরু ঘোড়ার মত খাটবে, গোরু ঘোড়ার মত মরে যাবে; মরার আগে রেখে যাবে তাদেরই মত আর কতকগুলি গোরু ঘোড়া যারা পিতৃ-পুরুষের মত নিজেদের পরিশ্রমের ধনে আজীবন অন্যের বিলাসের আয়োজন করবে।

এত বড় অন্যায়কে যে সমাজ মেনে নেয়, এত বড় অবিচারের বিরুদ্ধে যে সমাজ বিদ্রোহী হয় না, সে সমাজের ধ্বংস ত' অনিবার্য্য। যত দিন সমাজে শ্রমের মর্য্যাদা সমান না হবে ততদিন এই অন্যায়ের চাকা ঘুরবেই। কারণ আইন তৈরী করবে ধনীরা; আর, যে কাজ করবে না সে খেতে পাবে না, এই সকলের বড় আইন ধনীরা কখনই করবে না, কারণ এ যে তাদের স্বার্থের বিরোধী।

৪

অলস ধনী ব'লতে একথা আমরা যেন না বুঝি যে ধনীরা কোন কাজই করে না। কোন কাজ না ক'রে থাকা মুস্কিল। নরক হ'চ্ছে সেই জায়গা যেখানে দিবানিশি কেবল ছুটী আর ছুটী—। সারাদিন ফরাসে ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছি, মুখে হেজ্‌লিন স্নো মাখ্‌ছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটছি, চাকরকে দিয়ে গা ডলাচ্ছি, আর দিনে দশবার পোষাক বদলাচ্ছি—এই রকম কর্ম্মবিহীন একঘেয়ে জীবন যাপনের চেয়ে আমি রাস্তায় জুতা বুরুশ করা পছন্দ করি। অনেক বড় লোক তাই চুপ ক'রে ব'সে না থেকে পোলো খেলে, টেনিস খেলে, শীকার করে ; মোটের উপর একটা না একটা কিছু নিয়ে থাকে। বিলেতের বড় বড় ঘরের মেয়েরা রাত্রের আহারের পর এতক্ষণ নাচে এবং তাতে এত বেশী পরিশ্রম করতে হয় যে কৃষ্ণনগর থেকে চাপরা থানা পর্য্যন্ত যে ডাক নিয়ে যায় তাকেও তত পরিশ্রম ক'রতে হয় না। যারা এক-পুরুষে ধনী তাদের ছেলে মেয়েদের আলস্য কোন রকমেই ক্ষমা করা যায় না। তাদের ছেলেরা ঘরে ব'সে ব্রিজ খেলে, গায়ে হাওয়া

লাগিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, ময়দানে ম্যাচ দেখে, আর তাদের মেয়েরা শুধু হারমোনিয়াম্ বাজায়, মুখে হিমানী লাগায়, গল্প লহরী সিরিজের উপন্যাস পড়ে আর মাসিক বসুমতীর পাতা উল্টায়।

অবশ্য যাদের জীবনধারণের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না—তারা যে কেবল টেনিস খেলে আর শীকার ক'রে সময় কাটায় এমন নয়। জনসাধারণের কাজও (public work) তারা করে—না ক'রলে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা তাদের হাতছাড়া হ'য়ে যায়! জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ যাতে বড়লোকদের হাতের বাইরে চ'লে না যায় সেই জন্যই ত' সিভিল সারভিস্ পরীক্ষায় যোগ দেওয়া এত ব্যয়সাধ্য করা হ'য়েছে; গরীব লোকের ছেলের পক্ষে ঐ পরীক্ষা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বড়-লোকেরা যে সব আইন কানুন ক'রেছে তাতে সাধারণ লোকের পক্ষে কাউন্সিলে যাওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

গবর্ণমেন্টের কাজ চালাতেই হবে আর সেই কাজের ভার বড়লোকেরা নিজের হাতে নেবেই; কারণ তা যদি তারা না নেয় তবে সাধারণ লোকের হাতে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব চলে যাবে, বড়লোকেরা ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে থাক্‌বে। এই জন্যই দেখা যায়, কাউন্সিলের মন্ত্রীর পদ থেকে

আরম্ভ ক'রে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশসাহেব—সকলের পদ অধিকার ক'রে আছে লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা। এই সব ধনীলোকেরা অলস একথা ব'ল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যারা শাসন কার্য্য চালাচ্চে, তারা পক্ষপাতদুষ্ট: কেমন ক'রে নিজেদের দলের লোকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে সেই দিকেই সর্ব্বদা তাদের দৃষ্টি। যারা জাতির স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ব'লে মনে করে এমন লোকের হাতে শাসন কার্য্যের ভার সঁপে দিয়ে বড়লোকগুলো যদি কৃপা ক'রে স'রে দাঁড়াতো, নিজেদের দলের অন্যান্য লোকের মত গল্‌ফ্ খেলা আর শীকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো তবে ভালই হোতো।

নিজের উপার্জ্জিত নয়—এমন টাকা প্রচুর পরিমাণে থাকলেই যে মানুষ সব ক্ষেত্রে অলস ভাবে জীবন কাটায় একথা মনে করা ঠিক নয়। এমন মানুষ সবদেশে সব সময়েই দেখা যায়—যদিও তাদের সংখ্যা অল্প—যারা বিনা পরিশ্রমে বহু অর্থের অধিকারী হ'য়েও বিশ্বের সেবায় যথাসর্ব্বস্ব দান করে গেছে এবং আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেছে। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ধনীর কন্যা হ'য়েও ক্রীমিয়ান যুদ্ধে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না ক'রেছেন—জন রাস্‌কিনও প্রচুর অর্থের মালিক হ'য়ে

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অনেক টাকা ব্যয় ক'রে গেছেন।

'অলস ধনী' ব'লতে কি বুঝায় এতক্ষণ তা বলা হ'য়েছে। অলস মানে একেবারে কোন কাজ না করা বুঝায় না। অলস লোক তারাই যারা কোন প্রয়োজনীয় কাজ করে না, যারা কোন কিছু ভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করে না, কেবল ভোগ ক'রে যায়। সমাজে শতকরা দশজন লোক এই শ্রেণীর। সমাজে এই দশজনকে ঘরজামায়ের মত ব'সে ব'সে খাওয়াবার জন্য নব্বুই জন লোককে ক্রীতদাসের মত দিন রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় এই সব লোককে বাধ্য হ'য়ে বড়লোকদের জন্য খাটতে হয়। কাজ না ক'রলে তাদের খেতে দেবে কে? জমি, খনি, কলকারখানা সবইতো বড়লোকদের হাতে! গরীবের শুধু ক্ষুধার জ্বালা!

৫

ধনীরা শুধু পার্লামেণ্ট আর আদালত দখল ক'রেই ক্ষান্ত থাকেনি। ধর্ম্মের মন্দিরও তারা অধিকার ক'রেছে। পুরুতগুলো তাদের হাতের যন্ত্র। পুরুত-ঠাকুররা জানে, অধিকাংশ বড়লোকই অলস; কাজ করে

না, কেবল ব'সে ব'সে খায়, চোরের যেমন সাজা হওয়া উচিত তাদেরও তেমনি সাজা হওয়া উচিত। কিন্তু একথা মুখ ফুটে বলবার তাদের সাহস নেই; কারণ তাহ'লে যজমান খ'সে যায়! দুর্গাপূজায়, শ্রাদ্ধে আর ক্রিয়াকাণ্ডে মোটা দক্ষিণা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আচ্ছা, ব্রাহ্মণঠাকুররা ত' এদিকে গীতার শ্লোক আউড়িয়ে বলেন, ভগবানের চোখে সব সমান আর যারা সবাইকে সমান চোখে দেখতে পারে তা'রাই ঈশ্বরের প্রিয়। তবে কেন তাঁরা ধনী ও দরিদ্রের এই বৈষম্যকে দূর করবার চেষ্টা করেন না? গরীব লোকেরা বড় লোকদের চৌর্য্যবৃত্তির অবসানের জন্য উদ্যত হ'লেই তাঁরা কেন মেষের মত করুণ-স্বরে বলেন শান্তি! শান্তি! শান্তি! "Blessed are those that are meek for they are of heaven"—ধন্য তা'রা যারা শান্ত এবং নিরীহ; কারণ স্বর্গরাজ্যের তাহারাই অধিকারী। দারিদ্র্য যাদের শুধু দেহকে মারচে না, যাদের অবজ্ঞার পাত্র ক'রে তুলছে তাদের পক্ষে শান্তিতে থাকা ক্লৈব্য ছাড়া আর কিছুই নয়; তাদের পক্ষে শান্তি পাপ, সন্তোষ অপরাধ। অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষই তাদের ধর্ম্ম হওয়া উচিত; তবু পুরুত-ঠাকুররা যে তাদের কাছে শান্তির বাণী প্রচার ক'রে

থাকেন তা'র মানে তাঁরা বড়লোকের চাকর। গরীব লোক ক্ষেপে গেলেই বড়লোকদের, নিদারুণ বিপদ এবং সেই জন্যই তাদের পরকালে স্বর্গরাজ্যের লোভ দেখিয়ে এবং ইহকালে শান্তির বাণী শুনিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখবার প্রয়োজন এত বেশী। পুরোহিতেরা বড়লোকের এই প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্র মাত্র। এই জন্য দেখা গেছে, বিপ্লবের দিনে যারা সব-হারা তারা কেবল বড়লোকদের বাগান বাড়ী পুড়িয়েই ক্ষান্ত থাকেনি; গীর্জ্জা-ঘরেও তা'রা আগুন লাগিয়েছে।

এই ত' গেল ধর্ম্ম মন্দিরের কথা। এবার ইস্কুল সম্বন্ধেও দুচার কথা বলা উচিত। বিদ্যা বা জ্ঞানের মন্দির হবে নির্ম্মল, পবিত্র, সর্ব্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্ত। কিন্তু অলস বড়লোকদের কলঙ্কিত হাত সেখানে পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। গ্রামের হাই ইস্কুলে আমি মাষ্টারি করি। ইস্কুলের যিনি সেক্রেটারি তিনি মস্ত জমিদার; প্রকাণ্ড দো-মহলা বাড়ী; বাইরের ঘরে দিন রাত পাশার আর দাবার আড্ডা। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বুভুক্ষু প্রজার দল; পাঁজরের এক একটা হাড় গোনা যায়; দেনার দায়ে জমিদারের কাছে তাদের মাথা বিক্রী। আমি যদি ইস্কুলে ছেলেদের শিক্ষা দিই, যাদের শরীর

সুস্থ এবং যারা প্রাপ্তবয়স্ক অথচ যারা সমাজের হ'য়ে নিজে কোন কর্ম্ম করে না তাদের চোর ডাকাতের মতো ঘৃণা করা উচিত তবে সেক্রেটারি মশাই আমার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন তা মোটেই প্রীতিকর নয়। আমাকে পদত্যাগের পত্র দিতে তিনি বাধ্য করবেন। আমি যদি বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শেখাই, যে দেশে মানুষের মাথাপিছু দৈনিক আয় গড়ে দুই আনা মাত্র সে দেশে বড় লাটের বেতন দিনে সাতশত টাকা হওয়া কখনই উচিত নহে তবে শুধু যে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে তা নয়, রাজদ্রোহী ব'লে সম্রাটের অতিথিশালাতেও আমার স্থান হওয়া বিচিত্র নয়। অলস ধনীরা শুধু ধর্ম্ম মন্দির ও ইস্কুলে হস্তক্ষেপ ক'রে ক্ষান্ত হয়নি। বিজ্ঞানকেও তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্র ক'রেছে। যাদের টাকা আছে এমনি কয়েকজন লোক জুটে এক একটা কোম্পানী খাড়া করে আর সেই কোম্পানীর কাজ হয় কতকগুলো পেটেণ্ট ঔষধ তৈরী করা পয়সা করবার জন্য। কিন্তু গরীবের দরকার পেটেণ্ট ঔষধের তত নয় যত ভাতের, আর যেখানে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এমন বাসস্থানের।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার হুকুম দিয়েছিলেন, জার্ম্মানীর প্রত্যেক ইস্কুলে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখাতে হবে,

কাইজারের শাসনের মত এমন সুশাসন পৃথিবীতে আর কুত্রাপি হয় নি। যে শিক্ষক এরূপ শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী হ'তেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকুরিটী যেতো। এই অবিচারের ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য কাইজারের কতই না আমরা নিন্দা করেছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের বিদ্যালয়গুলিতে কি আমরা কাইজারের নীতি অনুসরণ করি না? আমরা বিদ্যালয়ে কাইজারের পূজার পরিবর্ত্তে ধন-কুবেরদের পূজার প্রবর্ত্তন ক'রেছি। এই ধনীদের বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্রবল থাক আর নাই থাক, যে হেতু তারা বড়লোক সেই হেতু তাদের বিরুদ্ধে একটি কথা বলবারও উপায় নেই। তা হ'লেই চাকরি যাবে। রাম, শ্যাম, হরি—সে দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ ক'রেই হোক আর মদ গাঁজা বেচেই হোক দুপাঁচ হাজার টাকার মালিক হ'লেই সমাজে তার সাত খুন মাপ।

অধিকাংশ লোক তাদের মত গঠন করে খবরের কাগজ প'ড়ে। তাই সংবাদপত্রগুলি যদি ধনীদের খপ্পর থেকে মুক্ত থাকতো তবে ইস্কুলগুলো তাদের হাতে থেকেও বিশেষ কিছু ক্ষতি ক'রতে পারতো না। কিন্তু খবরের কাগজ সব ধনীদের মুঠোর মধ্যে। একখানা দৈনিক কাগজের প্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'লে অন্ততঃ লাখ

টাকার দরকার। সুতরাং সেগুলোর মালিক সবই ধনী। অন্যান্য ধনীদের দেওয়া বিজ্ঞাপনের উপর তাদের নির্ভর ক'রতে হয়। সম্পাদক যদি এমন কোন কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে যা ধনীদের স্বার্থের বিরোধী কাগজের আফিসে তার পরমায়ু সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়। তার জায়গায় এমন লোক নেওয়া হয় ধনীদের স্বার্থ ষোলআনা বজায় রেখে যার লিখতে কলম বাধে না। ইস্কুল কলেজে যে মিথ্যা শিক্ষার সূচনা হয় খবরের কাগজগুলো সেই মিথ্যারই জের টেনে চলে। পার্লামেণ্ট, আদালত, গীর্জ্জা ইস্কুল আর সংবাদপত্র এই পঞ্চভূত একসঙ্গে মিলে যে মিথ্যার জাল বুনে চ'লেছে তার থেকে মুক্ত থাকা যে সে লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। খুব সবলচিত্ত আর স্বাধীন-চেতা লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর। দ্বাপরে সপ্তরথী ঘিরে অভিমন্যুর দেহকে মেরেছিল; কলিতে পঞ্চরথী মিলে আমাদের দেহ ও মনকে পিষে মারছে। We are all brought up wrongheaded to keep us willing slaves instead of rebellious ones. আমরা যা'তে এই মিথ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করি তার জন্য ছেলেবেলা থেকেই একটানা মিথ্যার ভিতর দিয়ে আমাদের মানুষ করবার ধনীদের এই

অবিরাম চেষ্টা। এই মিথ্যার জাল ভেদ করা এত শক্ত কেন?

কারণ, খানিকদূর পর্য্যন্ত ধনী গরীবের স্বার্থ এক। যখন থেকে তাদের স্বার্থ ভিন্নমুখী হয় তখন থেকেই জুয়াচুরির সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে রেলপথের দুর্ঘটনাকে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান ভয় করে। সুতরাং রেলওয়ে দুর্ঘটনার সম্পর্কে যে সব আইন তৈরী হয়, খবরের কাগজে যে সব প্রবন্ধ লেখা হয়, সবগুলোর উদ্দেশ্য দুর্ঘটনা বন্ধ করা। কিন্তু যেই প্রস্তাব করা হয়, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের খাটবার সময় কম ক'রে এবং বেতন বাড়িয়ে দিলে দুর্ঘটনার পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনা—অথবা অংশীদারদের মুনাফার অংশ কমিয়ে দিয়ে কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা উচিত অমনি পার্লামেণ্ট আর সংবাদপত্র মহলে কলরব উঠে—গেলো, গেলো, সব গেলো; দুর্দ্দান্ত বলশেভিকদের জ্বালায় সব গেলো।

৬

এতক্ষণ ধরে আমরা যে সব বিষয়ের আলোচনা ক'রেছি তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার মূলে আছে আয়ের বৈষম্য আর এই আয়ের

বৈষম্য লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনকে নরক ক'রে তুলেছে। আচ্ছা, কোটী কোটী লোক এমন ক'রে নিষ্পেষিত হ'চ্ছে—তবুও কেন তারা এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছে? কারণ তারা জানে না, আইন-কানুন, ধর্ম্ম, শিক্ষা আর জনমত কত বড় মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচু বিশ্বাস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মালী; মাইনে পায় বারো টাকা; ছেলেমেয়ে গুটি তিনেক; পরিবারটি ভালোই; নাম সুখমণি। বিপদে-আপদে হাকিম-সাহেব পাঁচু বিশ্বাসকে সাহায্য করেন; পাঁচুর মাতৃশ্রাদ্ধের অর্দ্ধেক ব্যয় সাহেবই বহন ক'রেছিলেন। সুখমণি হাকিম-গিন্নীর নিকট থেকে পূজার সময় কাপড় পায়, সাহেবের ছেলেদের ছেঁড়া কাপড়-জামা পাঁচুর ছেলেরাই পেয়ে থাকে; হাকিম সাহেবের মত হাকিম-গিন্নীর মনটিও বড় উদার। পাঁচু আর সুখমণির মুখে হাকিম-সাহেব ও তাঁর গৃহিণীর সুখ্যাতি ধরে না। এক পক্ষের এই যে দয়া-দাক্ষিণ্য এবং আর-এক পক্ষের এই যে কৃতজ্ঞতা এইখানেই তো সর্ব্বনাশের মূল। বঁড়শীতে গাঁথা টোপ যেমন মাছকে, ব্যাধের বাঁশী যেমন কুরঙ্গকে প্রলুব্ধ ক'রে মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, হাকিম আর হাকিম-গিন্নীর মত যারা বড় লোক তাদের দয়াও তেমনি করেই

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাঁচু বিশ্বাস আর সুখমণির কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ ক'রে তাদের চিত্তকে অল্পে সন্তুষ্ট করে রেখেছে। নিজের হীন অবস্থার মধ্যে যাদের সন্তোষ সেই অভাগারাই তো মৃত্যু-পথের পথিক।

জমিদার বাবু ছেলের অন্নপ্রাশনে কলিকাতা থেকে ষ্টার থিয়েটার নিয়ে এলেন। গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। তিন রাত ধ'রে থিয়েটার চল্‌লো; তার উপর একদিন গ্রামের আপামর জন-সাধারণের মধ্যাহ্ন-ভোজন। সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগলো; বসন্ত বাবুর মত এমন জমিদার আর হয় না; গরীবের তিনি একেবারে মা বাপ। সাধারণ নির্ব্বোধ লোক জাঁক-জমকটাই বেশী ভালবাসে; তলিয়ে কিছু দেখতে চায় না। তারা যদি নিজেদের প্রশ্ন করে, আচ্ছা এই যে আমোদ-প্রমোদ-ভোজন-আনন্দ—এর অবসান তিনটি দিনেই, না এর দ্বারা আমাদের স্থায়ী কল্যাণ হবে—তবে কিন্তু তাদের চোখ খুলতে বিলম্ব লাগবে না। তারা দেখবে, জমিদারের মোটরটি কিনতে যে পয়সা লেগেছে তাতে পঞ্চাশটা লোকের ঘর হতে পারতো; সুখমণি দেখবে, হাকিম-গৃহিণীর গায়ে যে গহনা গুলি আছে সে গুলি গড়াতে যা খরচ হয়েছে তার দ্বারা দশটা ছেলেকে—যারা দুধের অভাবে শুকিয়ে মরে—

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যেতো। মজা হচ্ছে, গরীবের ঘরের মেয়েরা মনে করে—হয় দু-চার জন মেয়ে সিল্কের সাড়ী এবং হীরের আংটী পরবে এবং বাকী সকলে ছেঁড়া ময়লা কাপড় প'রে থাকবে—নয় সবাইকেই ছেঁড়া অপরিচ্ছন্ন কাপড় প'রে থাকতে হবে। এই দুয়ের মাঝে যে আর একটা অবস্থা থাকতে পারে সে কথা তারা ভাবতে পারে না। কিন্তু মাঝামাঝি এমন একটা অবস্থাও আছে যেখানে সব মেয়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভদ্র বেশে থাকতে পারে। এই অবস্থার সৃষ্টি করতে হলে চাই নূতন ব্যবস্থা। এই নূতন ব্যবস্থায় কেউ সোনার গহনা ব্যবহার ক'রতে পারবে না যতক্ষণ না সকল মেয়ে ভদ্র পরিচ্ছদ পায়। That no woman should have diamonds until all women have decent clothes is a sensible rule—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। অবশ্য এই নিয়ম সকল মেয়ের কাছে ভালো লাগবে না। এমন অনেকে আছে যারা নিজের গায়ে সোনার গহনা থাকলেই যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করে, আর দশজনের কাপড় ছেঁড়াই হোক আর ভালোই হোক—সে বিষয়ে দৃষ্টি দেবার তাদের সময় নেই। আবার এমন লোকও আছে যারা অন্যের দারিদ্র্য দেখে গোপনে সুখ পায়।

কিন্তু মন যেখানে এমনি সঙ্কীর্ণ, মানুষ যেখানে নিজের সুখটাকেই বড় ক'রে দেখে, অন্যের দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করে না—সেখানে বিপ্লব তার লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে আসবেই, যেমন রুসিয়াতে সেদিন এসেছিলো। সোনার হীরের গহনা বাঁধা দিয়েও তখন ভাত মিলবে না; সিল্কের সাড়ীর বদলে ছেঁড়া পুরোনো সাড়ী পরে দিন কাটাতে হবে। বোকারা ভাবে—পুলিশের বন্দুক সেই বিপ্লবের ভয়ঙ্কর রাতকে ঠেকিয়ে রাখবে; যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্রমনা তারা ভাবে—বিপ্লব আসে আসুক ক্ষতি নেই—আমাদের মরবার আগে না এলেই হোলো।

ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, মানুষের ভাগ্য নিয়ে জগতে যে লটারী খেলা চলছে সেই খেলাকে অনেক লোক যে সমর্থন করে তার আর-একটা কারণ আছে। গরীব মেয়ে মনে করে—তার ছেলে জলপানি পেয়ে এক-দিন বড় লোক হবে এবং সেই আশাতে নিজে না খেয়ে ছেলের স্কুলের মাইনে আর বইয়ের খরচ যোগায়। কোন কোন বুদ্ধিমান ছেলে গরীবের ঘরে জন্মেও বৃত্তি পেয়ে বড় চাকরি যে না পায় তা নয়। কিন্তু সে দুই-একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের বেলায় সত্য হ'তে পারে—

সাধারণ রামাশ্যামাকে কিন্তু গরীব হ'য়ে জন্মিয়ে গরীব হ'য়ে মরতে হয়।

আমাদের বাড়ীর পাশে কুরচিপোঁতা। কুরচিপোঁতার বাহার সেখের ছেলে গোলাম সেখ আর রাজার ম্যানেজারের ছেলে সোমনাথ আমার সঙ্গে একত্র কেদার মাষ্টারের স্কুলে পড়তো। গোলাম আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে ছিলো; সে অবশ্য ইংরেজীতে আমাদের চেয়ে কাঁচা ছিলো কিন্তু অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা—সব বিষয়ে সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেতো। সোমনাথ আর আমার চেয়ে সে অনেক বুদ্ধিমান ছিলো। সোমনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পাস ক'রে বিলাতে গেলো—এখন সে উড়িষ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট; আমি খবরের কাগজে কলম ঠেলি—আর আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান গোলাম কৃষ্ণনগরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে।

যে সময়ে সোমনাথ তার বাবার পয়সার জোরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পুস্তকের পর পুস্তক শেষ ক'রতে লাগলো সেই সময়ে ভ্রাতা গোলাম সংসারের অভাবের তাড়নায় পুস্তক ছেড়ে কন্নিক হাতে করতে বাধ্য হোলো; তার এমন সুন্দর মস্তিষ্ক, এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন কাজেই লাগলো না—ছাদ পিটানো ছাড়া। এমনি ক'রে দারিদ্র্যের

মরুভূমিতে কত সুন্দর প্রতিভার কুসুম-ফোটা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। গোলাম যে ইঞ্জিনিয়ার হ'তে পারতো না, কে এ কথা বল্‌বে ? প্রকৃতির কাছে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই ; কাউকে সে খাতির করে না। সে খেয়ালী ; তার হাতের শ্রেষ্ঠদান সবাই পায় না ; সবাই রবীন্দ্রনাথ হয় না, সবাই এব্রাহাম লিঙ্কন হয় না। রবীন্দ্রনাথ বড়-লোকের ছেলে ; এব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকায় চাষার ঘরে জন্মেছিলেন। প্রকৃতির উপহার চাষার ঘরেও আসে, শুধু বড় লোকের ছেলেদের বেছে বেছে সে প্রতিভা বিতরণ করে না। প্রত্যেক দুশো লোকের মধ্যে যদি কুড়িজন বড় লোক হয় তবে প্রকৃতির প্রতিভার দান আসবে ন'জন গরীবের ছেলের হাতে আর একজন বড় লোকের ছেলের হাতে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে যদি সেই দানকে সার্থক করে চর্চ্চার দ্বারা আর গরীবের ছেলে যদি চর্চ্চার সুবিধার অভাবে প্রকৃতির সেই দানকে ব্যর্থ করে তবে সমাজে দশভাগের নয় ভাগ শক্তি কোনই সুফল ফলাতে পারে না—মাঠে মারা যায়। বাহারের ছেলে গোলামের মত বুদ্ধিমান ছাত্র—যে সুবিধা পেলে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডাক্তার হতে পারতো—সে এবং তার মত হাজার হাজার নিষ্পেষিত প্রতিভা ছাদ্র পিটিয়ে

আর কসরৎ চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে—আর সোমনাথের মত নিতান্ত সাধারণ ধরণের ছেলেরা বাবার পয়সার জোরে বিলাত ঘুরে এসে সমাজকে নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শক্তির কি অপব্যয়।

৭

সমাজ দুইটী দলে বিভক্ত। একদল ধনী ; আর একদল দরিদ্র। একদল মানুষের আয় খুবই বেশী ; আর একদল মানুষের আয় খুবই কম। এই আয়ের পার্থক্য, এই শ্রেণীগত বৈষম্য সমাজে বহু দুর্নীতির সৃষ্টি ক'রেছে যার ফল অত্যন্ত বিষময়। চারিদিকে এত যে ধর্ম্মঘট—এর মানে কি? এই সব ধর্ম্মঘটের জন্য কত মানুষ কষ্ট পায়, সমাজ কত অসুবিধা ভোগ করে—তবুও তো ধর্ম্মঘটের বিরাম নেই। কেন এমন হয়? হয় আয়ের তফাতের জন্য। রেলের বড়সাহেব বেতন পাবে মাসে পাঁচ হাজার টাকা আর কুলি পাবে পনেরো টাকা—রেলওয়ে ধর্ম্মঘট হবে না কেন? বিপ্লব বাসা বাঁধে শূন্য উদরে ; যেখানে পেটে ভাত নেই সেখানেই তো বিদ্রোহের জন্ম। ভরা পেটে কে কবে বিদ্রোহী হ'য়েছে? Now a starving man is a dan-

gerous man, no matter how respectable his political opinions may be. A man who has had his dinner is never a revolutionist, his politics are all talk.

এতক্ষণ আমরা দেখিয়েছি আয়ের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুক্তি। এবার দেখ্‌তে চাই—সমান আয় হওয়া কেবল উচিত নয়—তা সম্ভবপরও। সভ্যজগতের কাজকর্ম্ম যারা চালাচ্ছে তাদের অধিকাংশ লোকেরই আয় সমান। একজন পিয়ন কালো এবং আর একজন পিয়ন ফরসা হ'তে পারে, একজন পুলিস লম্বা এবং আর একজন বেঁটে হ'তে পারে, একজন মিস্ত্রী মুসলমান এবং আর একজন হিন্দু হ'তে পারে—কিন্তু রং অথবা ধর্ম্মের এই পার্থক্যের জন্য দুজন পিয়ন অথবা দুজন মিস্ত্রীর আয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? প্রত্যেক ব্যবসাতে মজুরির একটা সাধারণ মাপকাঠি আছে; প্রত্যেক চাকুরিতে বেতনের হার অনেকটা সমান! পুলিশ, সৈনিক এবং পিয়নের বেতন—মজুর, ছুতার এবং রাজমিস্ত্রীর মজুরি—বড়লাট এবং কাউন্সিলের মন্ত্রীর ভাতা সমান নয় বটে—বড়লাটের মাসিক ভাতা একুশ হাজার টাকার বেশী, পক্ষান্তরে একজন পিয়নের মাসিক বেতন বড় জোর কুড়ি পঁচিশ

টাকা,—কিন্তু সকল সৈনিকই সমান বেতন পায়—সকল জজসাহেবেরই মাহিনা সমান—পার্লামেন্টের দুইজন সদস্যের ভাতার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

অনেক লোক না ভেবে চিন্তে তোতাপাখীর মত আওড়ায়,—সবাইকে যদি সমান টাকা দাও তবে একদল লোক ভোগ বিলাসে টাকা ফুঁকে দিয়ে গরীব হয়ে যাবে, আর একদল লোক টাকা জমিয়ে বড় লোক হ'য়ে উঠবে ;—এক বছরের মধ্যে দেখবে, সমাজ পুনরায় ধনী আর দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। কুকুরের ল্যাজ কোনো দিনই সোজা হবে না। এর উত্তর হচ্ছে, চারিদিকে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক—যাদের আয় সমান তারা ত' সারা জীবন এক অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ ভাগ্যের জোরে নেপোলিয়নের মত বড় লোক হ'য়ে যেতে পারে—কেউ বা যীশুখৃষ্টের মত একেবারে পথের নিঃস্ব ফকির হ'তে পারে ; কিন্তু এটা একটা সনাতন বিধি যে, যাদের পেশা এক এবং সামাজিক অবস্থা এক তাদের বেতনও সমান এবং যে অবস্থায় তারা থাকে তার নীচেও তারা নামে না, উপরেও উঠে না। এটা আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি, দেশের সকল নর নারীর মধ্যে টাকা যদি আমরা

সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি তবে তাদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হবার প্রবৃত্তি অল্পই দেখা যাবে। পোষ্টাপিশের পিয়নদের বেতন সব সমান; তাদের আয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। তাদের মধ্যে একদল লক্ষপতি আর একদল ভিক্ষুক হয়েছে এমন ত' দেখা যায় না। সকলেই ত' সমান অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে যায়। আমরা যে নূতনত্বটুকু আনতে চাই তা হ'চ্ছে পোষ্টমাষ্টারের বেতন যত পিয়নেরও বেতন তত হওয়া উচিত; পোষ্টমাষ্টারেরও বেতন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের বেতনের অপেক্ষা কম হওয়া উচিত নয়। সকল জজসাহেবকে আমরা সমান বেতন দিই; দেওয়া যুক্তিযুক্ত ব'লেই দিই; সকল পেশকারকেও আমরা সমান বেতন দিই। একজন জজকে তিনশত টাকা এবং আর একজন জজকে তিন হাজার টাকা দিই না। একজন পেশকারের জন্য কুড়ি টাকা এবং আর একজনের জন্য একশত টাকা বেতনের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে আমরা সাম্যবাদকে সহজেই মেনে নিই। কিন্তু একজন জজকে একজন পেশ্কারের পনেরোগুণ বেশী বেতন দেবার সময় আমাদের যুক্তি অথবা বিবেক থাকে কোথায়? তখন সাম্যবাদকে মানিনা কেন? বহু কাচ্চাবাচ্চার পিতা

পেশকারকে যদি বলা যায়—তার বেতন পনেরোগুণ বাড়িয়ে দিয়ে জজসাহেবের বেতনের সমান করে দিলেও এক বৎসরের মধ্যে সে আবার গরীব হ'য়ে যাবে—তবে সে নিশ্চয় এমন সব মধুর ভাষা প্রয়োগ করবে যা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব টাকা সকলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। আয় যদি সকলের সমান ক'রে দেওয়া যায় তবে কার কত টাকার প্রয়োজন—কার কত আয় হওয়া উচিত এই জটিল সমস্যার সহজেই একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আর একটা প্রকাণ্ড সুবিধা। যদি সকলের আয় সমান হয় তবে টাকার জোরে মানুষ বড় হবে না, বড় হবে গুণের জোরে। মানুষের পদোন্নতি হবে গুণ দেখে—কাঞ্চন দেখে নয়।

৮

সমাজে সব মানুষের মূল্য সমান নয়। কতকগুলি মানুষ আছে যারা প্রতিভাশালী। তাদের প্রতিভার দান সমাজকে ঐশ্বর্য্যশালী করে, মানুষের সভ্যতাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। নিউটন, কলম্বাস, গান্ধী প্রতিভাশালী লোকের দৃষ্টান্ত। আর কতকগুলি মানুষ আছে

যাদের প্রতিভা নেই, হৃদয় নেই, আছে কতকগুলি টাকা। যেখানে একজন মানুষের আয় কম আর একজন মানুষের আয় বেশী সেখানে বিপদ হচ্ছে মানুষের মূল্যবিচার নিয়ে। টাকা যার বেশী সেই পায় সম্মান; আত্মীয় স্বজন তারই গুণগান করে; গার্ডেন পার্টিতে তারই হয় নিমন্ত্রণ; সমাজের খাসদরবারে তারই শুধু প্রবেশ করবার অধিকার। কাউন্সিলে প্রবেশ করতে হলেও চাই টাকা; মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হ'তে গেলেও চাই টাকা। টাকা যদি ঢালতে পারো সর্ব্বত্র তোমার জয়জয়কার। মুস্কিল তো এইখানেই।

মানুষটা কেমন—সেদিকে সমাজের খেয়াল নেই; মানুষটার কত টাকা আছে সেই দিকেই সমাজের দৃষ্টি। পকেটে যার নোটের তাড়া আছে—সর্ব্বত্র তার অবারিত দ্বার। কেমন ক'রে সে টাকা ক'রেছে এ প্রশ্ন কেউ তাকে ক'রবে না। এক টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় বিক্রী ক'রেই হোক, আর মদের দোকান ডেকে লোককে হুইস্‌স্কি খাইয়েই হোক, টাকা যদি কেউ জমাতে পারে সমাজের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সে আসন পাবে। তার পেটে বোমা মারলে 'ক' অক্ষর বেরুতে না পারে, সে মাতাল হ'তে পারে, চরিত্রহীন হ'তে পারে, কিন্তু কোন ভয় নেই

যদি তার টাকা থাকে। সমাজ সসম্মানে তাকে চেয়ার এগিয়ে দেবে, দুই হাতে তাকে কুর্ণিশ ক'রবে। পক্ষান্তরে টাকা যদি তোমার বেশী না থাকে, তুমি সত্যবাদী হ'তে পারো, নিঃস্বার্থ হ'তে পারো—কিন্তু সমাজের কাছে তুমি খাতির পাবে না। যারা ধনী তারাই সমস্ত সমাজযন্ত্রকে পরিচালিত ক'রছে। অন্তরের দিক দিয়ে তুমি দরিদ্র হও তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু টাকার দিক দিয়ে যতক্ষণ তুমি দরিদ্র না হ'চ্ছ ততক্ষণ সমাজের পুরোভাগে তোমার আসন অবিচলিত থাকবে।

বর্ত্তমান সমাজের এই অবস্থার জন্য একটা বিষময় ফলের উদ্ভব হ'য়েছে। অধিকাংশ লোক ভাবতে শিখেছে, টাকাটাই দুনিয়ার সব—কাল্‌চার কিছুই নয়। টাকা যাদের কাছে উপাস্য দেবতা হ'য়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে ভিতরের জীবনের (inward life) কোনই মূল্য নেই। পৃথিবীতে দুই হাতে মজা লুটে বেড়ানোকেই জীবনের পরম সার্থকতা ব'লে তারা মনে করে, আত্মার বিকাশ সাধনের কথা তাদের মনে স্থানই পায় না।

আয় যেখানে সকলের সমান সেখানে—যেহেতু একজনের টাকা বেশী সেই হেতু সে আর একজনের চেয়ে উঁচু আসন পাবে—এমন অবস্থা ঘটতেই পারে না।

সেখানে সম্মান পাবে সেই যার গুণ ও প্রতিভা আছে। টাকা বড় নয়, বড় হচ্ছে চরিত্র, ভদ্র ব্যবহার এবং কাজ করবার ক্ষমতা। Money is nothing ; character, conduct and capacity are everything. সংসারে বড়, ছোট আর মাঝারি, এই তিন শ্রেণীর লোক চিরদিনই থাকবে। কিন্তু এখন বড় ব'লে খাতির পায় তারাই যাদের টাকা বেশী ; যাদের টাকা নেই লোকে তাদের বলে 'পুওর ডেভিল'। আয় যখন সকলের সমান হবে, তখন যারা বড় কাজ ক'রেছে তারাই বড়লোক ব'লে সম্মানিত হবে : যেহেতু বাবা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছে সেই হেতু মস্তিষ্কে গোবর পোরা থাকলেও সমাজে সম্মান পাবো—তখন ঠিক সেই অবস্থা থাকবে না। তখন 'ছোটলোক' বলে অগৌরব পাবে তারাই যাদের মন ছোট আর চরিত্র নীচ হবে ; গরীব হোলেই মানুষ ছোটলোক আখ্যা পাবে না। এইজন্য যারা নীরেট গাধা তারা আয় সমান করবার বিপক্ষে, আর যারা সত্য বড় তারা আয় সমান করবার সপক্ষে।

৯

সব মানুষের আয় সমান হওয়া উচিত—সাম্যবাদের এই মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সবের অধিকাংশই শেখানো বুলি—পুরুত আর ইস্কুলমাষ্টারদের শেখানো বুলি। একজনের আয় মাসে আড়াই হাজার এবং আর একজনের আয় কেন মাসে পনেরো টাকা হবে—এই প্রশ্নের জবাবে বরাবর বলা হয়েছে, গরীব আর বড়লোক ভগবানই তৈরী ক'রেছে। পৃথিবীতে ফকীর আর আমীর এই দুই শ্রেণীর লোক চিরকাল ধ'রে আছে আর চিরকাল ধ'রেই থাকবে; মানুষে মানুষে ধনগত এই বৈষম্য বিধাতার বিধান। এই শাশ্বত বিধান যারা বদ্‌লাতে চায় তারা শুধু দুষ্টু নয়—তারা নির্ব্বোধ।

নীরেট গাধাদের এই উক্তি কত যে অসার তা আগেকার অধ্যায়গুলিতে প্রতিপন্ন করা হ'য়েছে। তবুও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এমন দু'চারটী প্রশ্ন আছে যার জবাব এখনও দেওয়া হয় নি। এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটী

হচ্ছে, মুড়ি মিছরির দর যদি সমান হয় তবে মানুষ কাজ ক'রবে কিসের লোভে।

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, মানুষ মনের দিক দিয়ে এ পর্য্যন্ত যে সকল বড় বড় জিনিষ সৃষ্টি ক'রে এসেছে তা কি টাকার লোভে ক'রেছে? রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি রচনা করেছিলেন তখন কি তার পিছনে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রলোভন ছিল? বেশী টাকা পাবো ব'লে কি আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা অথবা নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন? পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তার পিছনে রয়েছে মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রেরণা। সেই প্রেরণা কোন দিন টাকা পয়সাকে হিসাবের মধ্যে আনে না। চারিদিকের আব-হাওয়ার মধ্যে যেখানে প্রাণের প্রবাহ র'য়েছে, আত্মা যেখানে বাহিরের চাপে নিষ্পেষিত অথবা সঙ্কুচিত হয় না সেখানে মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পে ও সাহিত্যে সহজেই তা রূপ নেয়; তার জন্য টাকা পয়সার প্রলোভনের কোনই প্রয়োজন হয় না। যেখানে সেই প্রাণের ও আনন্দের প্রবাহ নেই সেখানে টাকার লোভ দেখিয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। All the most important work springs from an uncalculating impulse,

and is best promoted, not by rewards after the event, but by circumstances which keep the impulse alive and afford scope for the activities which it inspires,*

এ প্রশ্নও শোনা যায়, মানুষ বেশী মজুরি পেলেই বেশী পরিশ্রম করে। সব মানুষের আয় যদি সমান হয় তবে মানুষ বেশী খাটতে যাবে কেন ?

এর একটা উত্তর হচ্ছে, যে কাজ ব্যক্তি-বিশেষের নয় জাতির, তার জন্য কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, এ আমরা কেউ চাই না। পক্ষান্তরে আমরা চাই, পরিশ্রমের বোঝা সবাই সমান ভাবে বহন করুক। যদি কেউ বলে, আমি আরও খাটতে চাই, সারাক্ষণ না খাটলে আমি ভাল থাকি না সে খাট্‌তে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য সে কোনও পারিশ্রমিকের দাবী করতে পারবে না।

আর এক ধরণের লোক আছে যারা একটুও খাটতে চায় না ; পরিশ্রমের নামে তাদের গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু যেহেতু কাজ করতে আমার ভালো লাগে না সেই

* Bertrand Russel—Roads to Freedom

হেতু আমি খাটবো না—সাম্যবাদের যুগে এই যুক্তি দেখিয়ে কাজ থেকে রেহাই পাবার কোনই উপায় থাকবে না। সমাজ বা জাতির সমস্ত সম্পদের মূলে মানুষের মাথার বা বাহুর পরিশ্রম। পরিশ্রমের বেলায় ফাঁকি দেবো কিন্তু পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের বেলায় এক চুলও ছাড়বো না, পুরোমাত্রায় নিজের ভাগ বুঝে নেবো—এ আবদার চোরের আবদার। চোরের যেমন শাস্তি হওয়া উচিত, যে পরিশ্রম করে না অথচ ভোগ করে তারও তেমনি শাস্তি হওয়া উচিত। Anyone who does less than her share of work, and yet takes her full share of wealth produced by work, is a thief and should be dealt with as any other sort of thief is dealt with.

অ্যানার্কিষ্টরা (Anarchist) অবশ্য বলে, কাজ করুক বা না করুক, যার যতটুকু জিনিষের প্রয়োজন তার সেটুকু ভোগ করবার অধিকার থাকা উচিত। কাজ করতেই হবে—মানুষের উপর এমন কোন সর্ত তারা চাপাতে চায় না। পক্ষান্তরে সোস্যালিষ্টরা (Socialists) বলে, কাজ যে না করবে তার খাওয়ার অধিকার থাকবে

না। Thus Anarchism would not impose any obligation of work, though anarchist believe that the necessary work could be made sufficiently agreeable for the vast majority of population to undertake it voluntarily. Socialists, on the other hand, would exact work.

কিন্তু সোস্যালিষ্ট ও অ্যানার্কিষ্টদের মতের মধ্যে কোন্‌খানে পার্থক্য, তা নিয়ে আলোচনা করবার এখানে কোন প্রয়োজন দেখি না। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অন্য। রামায়ণ বা গীতাঞ্জলি লেখার মত যে সকল কাজ মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে করে সেগুলির প্রকৃতি হচ্ছে একটু অসাধারণ। সেখানে কাজের পিছনে রয়েছে সৃষ্টির দুর্ব্বার প্রেরণা, সেখানে কর্ম্মের উৎপত্তি আনন্দের উৎস থেকে। কিন্তু আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিদিন যে সকল কাজের প্রয়োজন হয় সেগুলি তো সব সময়ে আনন্দের নয়। শীতের ভোরে রাস্তার ময়লা বা নর্দ্দমা পরিষ্কার করা খুব কম লোক পছন্দ করে অথচ সে কাজ না করলে সহর নরককুণ্ড হ'য়ে ওঠে। সব কাজের বেতন যদি সমান হয় তবে নোংরা কাজ করবার

লোক পাওয়া যাবে কোথায়? লোকে সহজ কাজের দিকে ঝুঁকবে যার মধ্যে আনন্দ আছে।

এই সমস্যার উত্তরে প্রথমতঃ বলা যেতেপারে—যে-সকল কাজকে আমরা নোংরা কাজ বলি তা সাধারণতঃ গরীব লোকেই ক'রে থাকে। তাদের আচার ব্যবহার ভদ্রোচিত নয়; তাদের পরণে ময়লা কাপড়, মুখে নোংরা কথা, গায়ে ধুলো আর কালি। এই জন্যই সেই সকল কাজ করতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। ভাবি, সে সকল কাজ ক'রলে আমাদের সম্মানে আঘাত লাগবে। আরও ভাবি, মেথর, ধাঙড়, মুচি প্রভৃতি এক শ্রেণীর লোক না থাকলে নোংরা কাজগুলি অসম্পন্ন থেকে যাবে। অথচ এরকম ধারণা করবার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পৃথিবীতে বড় বড় ডাক্তারেরা ছুরি কাঁচি দিয়ে যে সব কাজ করে তা কি নোংরা নয়? ফোড়া অস্ত্র করে হাঁসপাতালে যারা পচা পুঁজ আঙ্গুল দিয়ে বার করে, তাদের অনেকেরই মোটর আছে, বড় বড় উপাধি আছে। তাদের কি আমরা সম্মান করি না? হাঁসপাতালের নার্সরা রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করে। নোংরা কাজ করে ব'লে তাদের ত' আমরা সম্মান কম করি না। বড় বড় পণ্ডিতরা ল্যাবরেটারিতে ব'সে বিষ্ঠা বিশ্লেষণে রত থাকে; বাড়ীতে

মা তুই হাতে ছেলের বমি ও বিষ্ঠা পরিষ্কার করে ; কিন্তু সে সব কাজকে হীন কাজ বলতে ক'জন সাহস পায় ?

আসল কথা হচ্ছে, কাজ নোংরা বলে কাজ যে আমরা অপছন্দ করি তা নয়। নোংরা কাজ যারা করে তারা গরীব। এই জন্যই আমরা সেই কাজ ক'রতে কুণ্ঠা বোধ করি। অনেক বড় লোক আছে যারা নিজের হাতে মোটর চালিয়ে থাকে ; কিন্তু শোফারের পোষাক পরে মোটর চালানো অপেক্ষা মৃত্যু তাদের কাছে শ্রেয়ঃ। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা যদি নিজের হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতেন তবে সে কাজ কারও কাছে অপমানের কাজ বলে মনে হ'ত না। ঝাড়ুদার সাহেবের গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রিত হ'ত। অনেক ভদ্রলোক দেখেছি যাঁরা মালীর সঙ্গে ব'সে ব'সে বাগানে আগাছা তুলছেন আর ফুলের গাছ লাগাচ্ছেন। কুকুর পোষার সখ আছে এমন ভদ্র-লোককে চাকরের সঙ্গে কুকুরের গায়ের এঁটুলি মারতে দেখেছি। সেই কাজ ক'রতে তাঁরা একেবারেই কুণ্ঠা বোধ করেন না। আসল কথা হচ্ছে, কাজ নোংরা ব'লেই যে কাজে মানুষের আপত্তি তা নয় ; সাধারণতঃ নোংরা কাজ সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক'রে

থাকে। সেই জন্যই নোংরা কাজ ক'রতে আমরা এত সঙ্কোচ বোধ করি।

তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সব রকমের দরকারী কাজ সমানভাবে সম্মানের যোগ্য হ'লেও সব কাজ আমরা সমান ভাবে পছন্দ করি না। সব কাজে মেহনৎও সমান লাগে না। পৃথিবীর আলোহীন জঠরের মধ্যে সেঁধিয়ে কয়লা তোলার কাজ কি খুব সুখপ্রদ? জাহাজের ইঞ্জিনের আগুনের তাতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কাজ করার মধ্যে কি আনন্দ আছে? এখন সমস্যা হচ্ছে, পোষ্টাপিশের জানালার ধারে চেয়ারে ব'সে পোষ্টকার্ড খাম বিক্রি ক'রে যে পরিমাণ টাকা উপার্জ্জন করা যায় কয়লাখনির মধ্যে ঢুকে কয়লা তোলা কাজেও যদি সেই পরিমাণ টাকা আসে, তবে মানুষ সহজ কাজ ছেড়ে কেন কঠিন কাজ ক'রতে যাবে? এ সমস্যারও উত্তর আছে। সব মানুষের রুচি সমান নয়; ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। ভগবান যত রকমের কাজ তৈরী ক'রেছেন, তত রকমের লোকও তৈরী করেছেন। ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্য জল্লাদেরও অভাব হয় না। চারিদিকে কূলহীন সমুদ্র; সেই সমুদ্রের মধ্যে লাইট হাউসে ব'সে কাজ করার মানুষও পাওয়া যায়।

কিন্তু রুচির বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে নিলেও এ কথা সত্য যে টেলিফোনে কাজ করার জন্য যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যায় নর্দ্দমা পরিষ্কার করবার জন্য ততখানি আগ্রহ কখনই দেখতে পাওয়া যায় না। এখন যে সব কাজ কষ্টসাধ্য বা নোংরা বলে মনে হয় তার অধিকাংশই অবশ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজসাধ্য ক'রে তোলা অসম্ভব নয়। কিন্তু যতদিন তা সম্ভবের রাজ্যে না আসে ততদিন লোকে সেই সব কাজের দিকে ঝ্ঁকবে যা সহজসাধ্য এবং নোংরা নয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, যে সব কাজ কঠিন বা নোংরা তাকে লোকের কাছে প্রিয় ক'রে তুলবার একটা উপায় আছে আর সেই উপায় হচ্ছে অবকাশ বা ছুটি। স্বাধীনতা আমরা সকলেই চাই। স্বাধীনতার মানে হচ্ছে সময়কে নিজের খুসীমত ব্যবহার করবার অধিকার। শ্রমিকেরা যখন দশ ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টার জন্য আন্দোলন করে তখন তারা যে আট ঘণ্টা কাজ করতে চায় তা নয়। তারা চায় দিনে রাতে চৌদ্দ ঘণ্টার জায়-গায় ষোল ঘণ্টার অবসর। নোংরা বা কঠিন কাজের জন্য আমরা যদি মানুষকে বেশী অবসর দান করি তবে নিশ্চয়ই লোকের অভাব হবে না। জেলের মধ্যে অনেক উচ্চ-

বর্ণের হিন্দু ও মুসলমানকে মেথরের কাজ করতে দেখেছি। সেই কাজ তারা করে অবসরের লোভে। মেথরের কাজে বেশী সময় খাটতে হয় না, কয়েদী প্রচুর অবসর পায়। তাই সে কাজ নোংরা হ'লেও ইচ্ছা ক'রে কয়েদীরা সেই কাজ নেয়। এখন যারা কঠিন কাজ করে—যেমন লোহা গালানোর কাজ—তাদের আমরা বেশী বেতন দিই। কিন্তু বেতনের পরিবর্ত্তে অবসরের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেও একই সুফল পাওয়া যায়। লোকে টাকার চেয়ে অবসরই বেশী পছন্দ করে। কাজ যেখানে আনন্দের জিনিষ নয় সেখানে টাকা দিলে যে সুফল পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যায় ছুটির মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। ছুটীর বাঁশি মানুষের কাছে সব চেয়ে মধুর।"

১০

প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতেখড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেখান উচিত, কাজ একেবারেই না করা শুধু স্বভাবের বিরোধী নয়, ন্যায়েরও বিরোধী। আমি যদি কাজ না করি, সেই কাজের বোঝা আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাজ না ক'রে উপায় নেই। কর্ম্ম

যদি বন্ধ কর, মনুষ্যজাতি দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যাবে। ইহা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর বিধান।

এখন একদল লোক কোন কাজ করে না, আরাম করে আর কতকগুলি নিঃসম্বল লোককে খাটিয়ে তাদের পরিশ্রমের পয়সায় নবাবী করে। এমন অবস্থায় কাজের বোঝা যাদের বহন করতে হয়, তারা স্বভাবতঃই কাজকে অভিশাপ ব'লে মনে করতে শিখে। কিন্তু সমাজে এমন অবস্থার যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি যেখানে কাজের বোঝা সবাইকে সমানভাবে বহন করতে হবে এবং কাজের পুরস্কারও সবাই সমান ভাবে পাবে, তবে কাজ মানুষের কাছে কখনও ভয়ের বস্তু হয়ে থাকবে না। যেখানে একজন মানুষ খাটে, আর একজন মানুষ খাটে না অথচ খায়, সেখানে যে মানুষটা খাটে তাকে দ্বিগুণ কাজ করতে হয়, যে খাটে না তার কাজের বোঝাও নিজেকে বইতে হয়। এরূপ অবস্থায় কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা আসা তো স্বাভাবিক; সদাই মনে হয়—কাজ আমার উপর চাপানো হচ্ছে; যারা খাটবে না সেই অলস ভূতদের বোঝা শুধু শুধু ব'য়ে মরি কেন? সবাই যদি কাজের বোঝা সমান ভাবে বহন করে তবে মনের এই অবস্থা কেন থাকবে? কাজ তখন মানুষের কাছে

আনন্দের বস্তু হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন মনে হবে, কাজ যত বেশী করি ততই ভালো; কারণ পরিশ্রম যে পরিমাণে করা যায় সমাজের সম্পদও সেই পরিমাণ বাড়ে, আর আদর্শ সমাজে পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদে সকলের সমান অধিকার থাকবে। কাজকে মানুষ ডরায় না, ডরায় অত্যধিক কাজকে। যেখানে আবহাওয়ার মধ্যে সজীবতার চিহ্ন আছে সেখানে কাজের মধ্যে মানুষ আনন্দ খুঁজে পায়। জাহাজে যারা কাজ করে তাদের পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী, তবুও কাজ তাদের কাছে আনন্দের বিষয়; কারণ সেই কাজ মুক্ত আকাশের নীচে; তাছাড়া নূতন নূতন দেশ দেখার আনন্দ তো আছেই।

কাজের মধ্যে নেই সম্মান, নেই আনন্দ, নেই ছুটীর বাঁশী। দিনের পর দিন একটানা একঘেয়ে কাজ, খাটতে খাটতে শরীর ক্লান্ত হ'য়ে যায়। সেই কাজের পাষাণ-কারাগার থেকে একটু মুক্তি পেলেই উত্তেজিত মানুষ অমনি ছোটে মদের আড্ডায় আনন্দের সন্ধানে, নয়তো কার্ণিভালে অথবা ফুটবলের ম্যাচে আমোদের আশায়। একঘেয়ে দীর্ঘ একটানা কাজের পর দু' চারদিন অবসর পেলেই মানুষ হাতের মাথায় যা পায় তা আঁকড়ে ধরে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষায়। ছুটি কেমন করে ভোগ করতে হয়
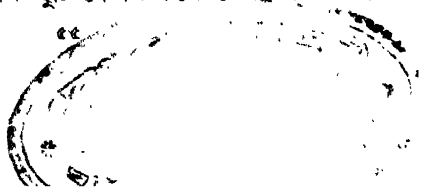
তা সব মানুষ জানে না, ওটা শিখ্‌তে হয়। মানুষ প্রত্যেক দিন কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রচুর অবসর পায় তবেই শিখতে পারে, কেমন ক'রে আনন্দ দিয়ে জীবনকে ভ'রে তুলতে হয়।

কাজও চাই, ছুটিও চাই; তবেই কাজ সরস হয়। এখন যারা মাঠে, কারখানায়, খনিতে কাজ করে তাদের যদি আমরা কাজের সঙ্গে প্রচুর অবসরের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি কাজের মধ্যে তারা তৃপ্তি খুঁজে পাবে; খাঁটি-আনন্দ ছেড়ে তারা মেকী আনন্দের পিছনে ছুটবে না। যে মানুষ বাস্তবিকই সুস্থ সে কখনও সময়কে হেলায় নষ্ট করতে পারে না। যে ছেলে সুস্থ সে সর্ব্বদাই কিছু-না-কিছু নিয়ে আছেই: তার হাত-পা কখনও স্থির হয়ে থাকবে না। সুস্থ মানুষও চঞ্চল বালকের মত; কাজের মধ্যেই তার আনন্দ। অধীর আনন্দে বালি দিয়ে দুর্গ তৈরী করা যেমন বালকের পক্ষে স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের পক্ষে সত্যিকারের দুর্গ তৈরীর মধ্যেও তেমনি একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে।

কাজ করার মধ্যে মানুষের যে কত বড় একটা আনন্দ আছে তা আমরা সকল সময়ে বুঝি না; কারণ যারা খাটে তারা পরিশ্রম করে অত্যধিক অথচ সম্মান পায়

কম। খাটুনির হাত থেকে অব্যাহতি পেলেই তাই তারা পাপের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। সেই পাপ তাদের পরিশ্রমের মতই উৎকট। তাদের পরিশ্রমের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে অবসরের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেও সেই পাপ তারা করতে থাকবে, পুরাতন অভ্যাস ছাড়তে পারবে না। কিন্তু তাই বলে হতাশ হবার প্রয়োজন দেখি না। তারা ম'রে যাবে কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতাকে ভোগ করতে পারবে। তারা অবসর সময় মদ খেয়ে নষ্ট করবে না; তখন তারা চিত্তবিনোদনে জন্যে এমন সব কাজ করবে যা শুধু প্রয়োজনীয় নয় সুন্দরও।

১১

একদল লোক আছে যারা বলে, আমাদের দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে লোক সংখ্যার আধিক্য। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বল্লে দাঁড়ায়, পৃথিবীর আয়তন এত ছোট যে জগতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাতে সব লোকের কুলায় না।

কথাটা একেবারেই সত্য নয়। পৃথিবীতে যে সম্পদ উৎপন্ন হচ্ছে তাতে সকলেরই কুলিয়ে যায় যদি সবাই

পরিশ্রম করে এবং সকলের মধ্যে সেই পরিশ্রমের ধন সমান ভাবে বটন করা হয়। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ অন্য রকম। পৃথিবীতে অর্দ্ধেক লোক খাটে—খেটে সম্পদ সৃষ্টি করে। বাকী অর্দ্ধেক লোক খাটে না: যারা খাটে তাদের ঘাড়ের উপর পরগাছার মত চেপে জীবনভোর খেয়ে যায়; নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য একটুও গতর খাটায় না।

এই কথাটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যদি বাড়ীর চাকরদের কথা ধরা যায় এক এক জন ধনী লোক আছে যাদের বাড়ীতে কুড়ি পঁচিশ জন চাকর। দেউড়ীতে দ্বারোয়ান, কোচোয়ান, পাইক বরকন্দাজের দল সিদ্ধি খায়, ঘুমায় আর মাঝে মাঝে ফায়-ফরমাস খাটে। ভিতরে ঝিয়েরাও তথৈবচ; সিদ্ধির বদলে পান খায় আর ঝগড়া করে। এই সব চাকর-চাকরানীর দল নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরা সৃষ্টি করে না—নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্ভর করে অন্যের উপর—মনিবের উপর। মনিব হয়তো জমীদার; নয় চা-বাগানে অথবা কাপড়ের কলে তাঁর মোটা রকমের সেয়ার আছে। তিনিও নিজে পরিশ্রম করেন না, নির্ভর করেন ভাত-কাপড়ের জন্য গ্রামের কৃষকদের মেহনতের উপর,

নয়তো চা-বাগানের অথবা কাপড়ের কলের কুলী মজুরের পরিশ্রমের উপর। তাহ'লে দাঁড়ায় কি? ইমারত, দাসদাসী, মনিব সব পরগাছার মত অন্যের কাঁধে চেপে আছে—কেউ স্বাবলম্বী নয়। জগত এখন যত বড় তার চেয়ে আকারে দশগুণ বৃহৎ হলেও এমনি এক দল লোক আর এক দলের কাঁধে চেপে খেতো, নিজেরা কোন সম্পদ সৃষ্টি করতো না। জগতে লোকের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছে—একথা সত্য নয়। অলস নিষ্কর্ম্মার দল অত্যন্ত বেড়ে গেছে—আর বেড়ে গেছে পরিচারক পরিচারিকার দল যাদের সময় নষ্ট হয় যত সব আলসে নবাবদের পরিচর্য্যায়। এই সব নিষ্কর্ম্মার হাত থেকে জগতকে মুক্ত কর; আর পরিচারক পরিচারিকাদের লাগিয়ে দাও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজে। তাহ'লে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত একথা আর শুনতে হবে না যে জগতে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। Instead of too many people in the world there are too many idlers and much too many workers wasting their time in attending to idlers.

পাটিগণিতের অঙ্কের মত ক'রে বোঝালে বিষয়টা

কারও কারও কাছে সহজ হয়ে উঠ্‌তে পারে। ধর, কুড়ি-জন লোক জমিতে পরিশ্রম করে। সারা বৎসরে পরিশ্রম ক'রে তাদের প্রত্যেকে যা উৎপন্ন করে তার মূল্য একশত টাকা। একশত টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা তারা দেয় অথবা আইনের দ্বারা দিতে বাধ্য হয় ভূস্বামীকে যার ভূমিতে তারা খাটে। তাহ'লে ভূস্বামী বছরে পায় এক হাজার টাকা—পরিশ্রমের জন্য নয়—যে হেতু সে জমির মালিক সেই জন্য। এই এক হাজার টাকার মধ্যে জমিদার নিজের জন্য ব্যয় করে পাঁচশত টাকা। এই পাঁচশো টাকা আয় মানে ভূস্বামী কুড়িজন শ্রমিকের প্রত্যেকের চেয়ে দশগুণ বেশী টাকার মালিক। বাকী পাঁচশো টাকা দিয়ে সে ছয়জন চাকর এবং একজন বালক ভৃত্য নিযুক্ত করে—প্রত্যেককে বেতন দেয় বছরে ৭৫৲ টাকা। লোকগুলি যে কেবল ভূস্বামীর পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হয় তা নয়—কুড়িজন মজুরের মধ্যে কেউ যদি বিদ্রোহী হয়ে খাজনার টাকা দেওয়া বন্ধ করে তাকে দমন করাও তাদের আর একটা প্রধান কাজ। মজুরদের বেতন ৫০৲ টাকা, ছয়জন পাইকের বেতন মজুরের চেয়ে বেশী বলে কখনই তারা মজুরদের পক্ষ নেবে না। বোকা বরকন্দাজগুলোর মাথায় এই বুদ্ধি ঢোকে না যে সবাই যদি তারা একযোগে

মালিকের ভূতকে ঘাড় থেকে নামিয়ে সমাজের পক্ষে হিতকর কাজ করে তবে প্রত্যেকেই বছরে একশো টাকা ক'রে পায়।

এই কুড়িজন মজুরের সংখ্যা এবং ছয়-সাতজন পরিচারকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দাও। তাহ'লেই প্রত্যেক দেশের শাসনকার্য্যের ঠিক ঠিক স্বরূপটা উপলব্ধি করা যাবে। প্রায় সকল দেশেই একদল ধনী মালিক আছে। আমাদের দেশেও আছে—একদল দেশী আর একদল বিদেশী। তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে বিশাল পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আছে হাজার হাজার পরিচারক; তাদের মোটর গাড়ী, সিগার, শ্যাম্পেন এবং অন্যান্য বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য আছে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য শ্রমিক। এদের কেউ স্বাবলম্বী নয়; সব পরগাছার মত দাঁড়িয়ে আছে দেশের নিঃস্ব কৃষকদের উপর—যারা ধান, গম, তুলা প্রভৃতি যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি ক'রছে বুকের রক্ত জল ক'রে। দেশের এবং সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয় এমন কাজ এই সব কৃষকেরাই করছে। এরা নিজেদের খাওয়াচ্ছে, অলস ভূতদেরও খাওয়াচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়লে দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়বে, না দারিদ্র্য বাড়বে, তা জমির

উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে অতি-রিক্ত লোকের মঙ্গলজনক কাজ করা না-করার উপর। যদি আমাদের সব লোক জমিতে, খনিতে বা কারখানায় সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয় দেশের ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই বাড়বে। যদি দেশের বহু লোক এমন কাজ করে যা দেশের কোন সম্পদই সৃষ্টি করে না, ধনীদের ঐশ্বর্য্য রক্ষায় অথবা বিলাস-দ্রব্য নির্ম্মাণে আপনাদের পেশীর শক্তি ব্যয় করে, তবে দেশের দারিদ্র্য নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে। তাদের পরিশ্রমের ফলে জমিদার, মহাজন এবং অন্যান্য ধনী সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পেতে পারে—সিল্কের সাড়ী, হীরের দুল এবং মোটরের আড়ম্বর বাড়তে পারে; কিন্তু সেই পরিশ্রম দেশের জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য কখনই বাড়াতে পারবে না।

ভারতবর্ষ যে এত গরীব তার প্রধান কারণ লোকের জমির অভাব বা জমির উর্ব্বরতার অভাব তত নয়। আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ—শোষণ। দেশের এবং বিদেশের হাজার হাজার ধনী নরনারী কোন কাজই করে না, কৃষকের ঘাড়ে পরগাছার মত তারা চেপে ব'সে আছে; বিলাস সাগরে নিজেরা সাঁতার দেয়, অসংখ্য পরিচারক-পরিচারিকাদের

দিয়ে বিলাসদ্রব্য নির্ম্মাণ করায়। এই সব পরগাছাদের পোষণ করা হাতী পোষার মতই ব্যয় বহুল। এত লোক যেখানে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে খায়, কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না, দেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেয় না, কেবল স্বার্থ নিয়ে থাকে, সে দেশ দারিদ্র্যের চরম সীমায় নামবে তার আর আশ্চর্য্য কি? আমরা যে এই অন্যায় অবিচার পুরুষ পরম্পরায় এখনও পর্য্যন্ত সহ্য করে চলেছি এইটিই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য।

কোন দেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই দেশে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াও স্বাভাবিক এবং উচিত। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন লোক নিযুক্ত হতে পারে। এক জনকে তা হ'লে সব কাজ করতে হয় না—রবিন্সন ক্রুশোর মত। ফলে যে যে-কাজ নিয়ে থাকে সেই কাজে সে খুব দক্ষতা লাভ করে। এইজন্য দেখা যায় দশজন লোকে যে কাজ করে, কুড়িজন লোক তার দ্বিগুণের বেশী কাজ করে, কুড়িজন লোকে যে কাজ করে, একশো জন তার পাঁচগুণের অধিক কাজ করতে পারে। যদি উৎপন্ন সম্পদ সবাই সমানভাবে পেত, পরিশ্রমের বোঝা সবাই সমান ভাবে বহন করত—তবে যেখানে দশজন লোকের বাস সেখানকার চেয়ে সম্পদশালী হ'ত সেই স্থান

যেখানে একশজন লোকের বাস। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও লোকের অবস্থা যে স্বচ্ছল নয় তার কারণ আল্‌সে নবাবের দল আর তাদের আশ্রয় ক'রে যারা আছে সেই সব পরভোজীগণ। এই সব আল্‌সে পরগাছার দল জনসাধারণকে লুণ্ঠন ক'রে খাচ্ছে যেমন ক'রে আমরা হতভাগ্য মৌমাছির মধুচক্র লুণ্ঠন ক'রে মধু খাই।

১২

সকলের আয় সমান করার বিপক্ষে যে সব যুক্তি আছে আমরা একে একে তার উত্তর দিয়েছি। তবুও সকল প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলে থাকেন, আয় সকলের সমান হওয়া উচিত নয়। সমাজে পুরুষ বা নারী তার নিজের পরিশ্রমের দ্বারা যতটুকু উৎপন্ন করবে ঠিক ততটুকুতেই তার অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ঠিক কতখানি কে সৃষ্টি করেছে তা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

নির্জ্জন দ্বীপে রবিন্সন ক্রুশোই শুধু বলতে পারতো—নৌকা, বেড়া, ঘর সব আমার; কারণ শুধু আমারই পরিশ্রম তাদের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে

সভ্যজগতে ফিরে এল সেই মুহূর্ত্তে চেয়ার টেবিল কোন বস্তুকেই আর নিজের বলবার তার ক্ষমতা রইল না। একখানা চেয়ার বা টেবিল গড়তে দশ-বার জনের পরিশ্রম লেগেছে। যে গাছ লাগিয়েছে, যে তবলদার গাছ কেটেছে, যে করাতী গাছ চিরেছে, যে ছুতার জিনিষ বানিয়েছে—সকলের পরিশ্রম রয়েছে চেয়ারের পিছনে। কারখানায় রাশি রাশি আলপিন তৈরী হয়। সেই আলপিনের কে কতগুলি পাবে? যে যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে সব দেখাশুনা করে সে কতগুলি পাবে? যে যন্ত্রের আবিষ্কার করেছে তার ভাগেই বা কত পড়বে, আর যে ইঞ্জিনীয়ার হাতে কলমে যন্ত্রকে গড়েছে সেই বা কতগুলি আলপিনের মালিক হবে? নিজের জীবন বিপন্ন করে, অসহ্য যাতনার মধ্য দিয়ে কেবল নিজের পরিশ্রমে শুধু মা সৃষ্টি করে তার সন্তানকে। কিন্তু সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করে মা বাঁচে না—সন্তানই মাকে আশ্রয় ক'রে বাঁচে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—নিজের পরিশ্রমে যতটুকু উৎপন্ন হয় ঠিক ততটুকুতেই মানুষের অধিকার থাকা উচিত—এ যুক্তির কোন অর্থ নেই।

তারপর এমন লোক অনেক আছে যারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন করে না কিন্তু যাদের সেবা না হ'লে সমাজের চাকা

বন্ধ হ'য়ে যায়। পিয়ন কোন দ্রব্য উৎপন্ন করে না, সে শুধু চিঠি আর পার্সেল বিলি করে। সৈনিক—সৃষ্টি করা দূরের কথা—শুধু ধ্বংস করে; ডাক্তার কখন কি ঔষধ খেতে হবে তাই শুধু ব'লে দেয়। অথচ পিয়ন, সৈনিক অথবা ডাক্তার না হ'লে চলে না। তাদের সেবা চাইই চাই। এই সব লোকের বেলায় আমরা কি ক'রব? তারা ঘর বাড়ী, জানালা দুয়ার সৃষ্টি করে না ব'লে তাদের আমরা অপাংক্তেয় ক'রে রাখব? সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন নেই?

কে কত মজুরী পাবে তা ঠিক করা যেতে পারে কাজের সময়ের অনুপাতে। কেউ বারো আনায় একঘণ্টা কাজ করতে রাজি হয়েছে; কেউ আবার একঘণ্টা খাটুনির জন্য একশো টাকা দাবী করে। আমরা একজন ডাক্তারকে পেটের মধ্যে ফোড়া অস্ত্রের জন্য একবারেই একশো টাকা দিই—একজন ব্যারিষ্টারকে একদিনে পাঁচশো টাকা দিতে কার্পণ্য করি না। ভালো ব্যারিষ্টার অথবা সার্জ্জেন কম; অথচ হাজার হাজার মক্কেল অথবা রোগী রয়েছে যারা চায় ব্যারিষ্টার অথবা সার্জ্জেন অন্যের জন্য না খেটে তাদেরই জন্য খাটুক এবং এই পরিশ্রমের জন্য হাজার

হাজার টাকা ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত। ব্যবসায়ে যেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম অথচ চাহিদা বেশী সেখানে মজুরী বেশী পাওয়া যায়। যেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশী অথচ চাহিদা কম সেখানে মজুরী কম হ'য়ে থাকে।

কিন্তু চাহিদার অনুপাতে মজুরী ঠিক করায় বিপদও আছে। একজন ঘণ্টায় এক হাজার টাকা পাবে, আর একজন ঘণ্টায় ছয় আনা পাবে—এর কি কোন যুক্তি আছে? যেহেতু একটা ছেলের মুখখানি সুন্দর এবং হাবভাবের সঙ্গে ভালো অ্যাক্ট করতে পারে সেই হেতু সে থিয়েটারে মাসে দু'শ টাকা পাবে এবং যেহেতু তার প্রতি-বেশীর ঐ গুণ নাই সেইহেতু সে মাসে কুড়ি টাকা পাবে—কোন্ যুক্তি দিয়ে এই বৈষম্য সমর্থন করা যায়? সন্তান-বৎসলা সাধ্বী স্ত্রী ইস্কুলে মাষ্টারি ক'রে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাবে—যেহেতু ঐ টাকার অনেক মাষ্টারনী পাওয়া যায় —আর তার বোন কুপথে গিয়ে দেহ বেচে একরাত্রে হাজার টাকা পাবে—যেহেতু সে অপরূপ সুন্দরী এবং বাজারে সুন্দরী মেয়ের সংখ্যা কম অথচ চাহিদা বেশী। চাহিদা অনুসারে মজুরী দেওয়া ব্যবস্থা হ'লে এমনি কুফলই ফলে!

কেউ কেউ বলেন, গুণ অনুসারে আয়ের তারতম্য

হওয়া উচিত। কিন্তু গুণ অনুসারে কে কত টাকা পাবে তা নির্দ্ধারণ করবার মাপকাঠি কি? গ্রামের কামার লাঙ্গলের ফাল তৈরী করে। সহরের অধ্যাপক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াতে অদ্বিতীয়। কামারেরই বা মাসে কত পাওয়া উচিত আর অধ্যাপকেরই বা কত পাওয়া উচিত? অধ্যাপক মহাশয় কলেজে এম এ, পাশ করেছেন। কিন্তু সে ত' তাঁর বাবার টাকায় কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে। সেখানে তাঁর কৃতিত্ব কি? কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-নাথের কবিতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন—যা কামার-নন্দন পারে না। কিন্তু কামারও ত' লাঙ্গলের ফাল তৈরী করতে পারে যা অধ্যাপক মহাশয় পারেন না। লাঙ্গলের একখানা ফাল গড়ার মূল্য কতগুলি কবিতার ব্যাখ্যা করার সমান—তা নিরূপণ ক'রবে কে? বোম্বাই আম ভালো না বাগবাজারের রসগোল্লা ভাল—এ প্রশ্ন নির্ব্বোধের প্রশ্ন।

আবার অনেক আছেন যাঁরা বলেন, সমাজে যত রকমের কাজ আছে তত রকমের শ্রেণী থাকা উচিত আর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেতনের হার হওয়া সমীচীন। ডাক্তার, মাষ্টার, যত পাবে—মেথর,ঝাড়ুদারের তত বেতন হওয়া উচিত নয়।

ছেলেবেলা থেকে আমাদের মনে এই ধারণা পুষ্ট হয়ে এসেছে যে যারা লেখা পড়া জানে যারা ভদ্রলোক তাদের বেতন আর যারা লেখাপড়া জানে না, গতর খাটিয়ে খায় তাদের বেতন এক হওয়া উচিত নয়। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের বেতন অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু এমন তো কোন শাশ্বত বিধান নেই যে যার জন্য এক শ্রেণীর লোক বেশী এবং আর এক শ্রেণীর লোক কম বেতন পাবে। চোখের সামনে দেখছি কি? ইঞ্জিনের ড্রাইভার লেখা পড়ার ধারও ধারে না, কলেজে কোনো কালে পড়েনি, ভদ্রতার মিথ্যা আড়ম্বর নেই—সে এম-এ পাশ-করা অনেক শিক্ষিত ইস্কুল মাষ্টারের চেয়ে বেশী বেতন পায়। সুতরাং যেহেতু অমুক বেশী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছে এবং বেশী লেখাপড়া জানে সেইহেতু সে বেশী বেতন পাবে—এ ধারণা বদ্‌লে ফেলা উচিত।

আর একটা ধারণা আমাদের পরিবর্ত্তন করা উচিত। আমরা মনে করি, একজন ছুতোরের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে টাকার প্রয়োজন, একজন জজ সাহেবের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তার চেয়ে বেশী টাকার প্রয়োজন। কেন—জিজ্ঞাসা করি! দেহকে কর্ম্মক্ষম রাখবার জন্য একজন ছুতোরের যে পরিমাণ দুধ ঘি মাছ বা আটা

খাওয়ার প্রয়োজন সেই পরিমাণ দুধ ঘি মাছ আটা এক জন রাজার দেহকেও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়ে রাখিতে পারে। রাজা যা খায় তার চেয়ে গরীব লোক অনেক সময়ে বেশী খায়। রাজার পোষাক ছিঁড়তে যত সময় লাগে গরীবের পোষাক ছিঁড়িতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। রাজার টাকা বাড়িয়ে দিলে সে কি দ্বিগুণ খাবে? দ্বিগুণ ঘুমাবে? নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করবার প্রয়োজন অনুভব করবে? না নূতন রাণী বিয়ে করবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য একজন ছুতোরের যা লাগে একজন রাজারও যদি তাই লাগে, তবে দুইজনের আয়ের তারতম্য হবে কেন?

তারতম্য যে আছে তার কারণ—কার কি পাওয়া উচিত সে ত আমরা ঠিক করে দিইনি, গায়ের জোরে বা বরাতের জোরে যে যা পেয়েছে তাই সে অধিকার করে আছে। সাম্যের যুগ আসছে, বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে।

১৩

কেউ কেউ ব'লে থাকেন—সমাজে একদল লোক থাকার দরকার যাদের কাজ হবে দেশের আইন কানুন তৈরী এবং দেশ রক্ষা করা—যারা ক্ষত্রিয় হ'য়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে জাতিকে রক্ষা করবে, ব্রাহ্মণের মত বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করবে। এই শ্রেণীর লোক হবে সমাজের অন্যান্য শিরোমণি ; এই শিরোমণির দলকে খাওয়াবে সমাজের অন্যান্য লোক। কেন খাওয়াবে ? কারণ একদল উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবেশী না থাকলে মানব সমাজে সভ্যতার হোমানল জ্বালিয়ে রাখবে কারা ? চাই একদল ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ, আর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সেবা করবার জন্য চাই অগণিত শূদ্রের দল যারা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে, খাবে পান্তাভাত আর নুন, আর রেখে যাবে তাদেরই নিঃস্ব পুত্র কন্যার দল ধনীদের পরিচর্য্যার জন্য।

মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু শূদ্রেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের পরিচর্য্যা করবে তারা যে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক মত পালন করবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? দেশের

আইন-কানুন সৃষ্টি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের উপর অর্পিত হয়েছে, কৃষকের খাজনার টাকা থেকে যাদের বেতন যোগাচ্ছে সেই সব হোমরা চোমরা ভদ্রলোকেরা কেমন ক'রে দেশ শাসন করছে—শুনি? গ্রামে গ্রামে যাও; রুগ্ন, অশিক্ষিত, অর্দ্ধনগ্ন এবং বুভুক্ষু নরনারীর দল সুশাসনের সাক্ষ্য দেবে।

যেখানে শাসকের দল রইলেন সহরে প্রাসাদের মধ্যে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে, গ্রামের লোকের সঙ্গে যেখানে তাদের জীবন্ত সম্পর্ক নেই সেখানে শাসনের নামে কুশাসনই হবে। সেখানে শাসকের দল চেষ্টা করবে নিজেদের ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াবার জন্য, দরিদ্র সেখানে আরও দরিদ্র হবে। সেখানে তারা খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদের পিছনে অজস্র টাকা ব্যয় করবে; সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং জ্ঞান প্রচারের জন্য অতি অল্পই ব্যয়িত হবে। তারা ইস্কুল কলেজ স্থাপিত করবে নিজেদের গৌরব প্রচার করবার এবং অপরাধের কালিমা ঢাকার উদ্দেশ্যে।

যখন কোন দেশে এই রকম অবস্থার উৎপত্তি হয় তখন কেন যে সাহিত্য বা বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য অথবা শাসন কার্য্য সুপরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে একদল স্বার্থ-

পর মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব'সে ব'সে খাওয়াতে হবে তার কোন কারণই আমরা খুঁজে পাই না।

কি হবে শাসনের আড়ম্বর পূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে—মানুষ যদি খেতে না পায়? ।ক হবে বিজ্ঞান ও কবিতার চর্চ্চায় মানুষের পরিধানে যদি বস্ত্র না থাকে? যাদের আমরা চাষাভূষা বলে ঘৃণা করি তারাও গান ভালবাসে—তাদের বাউলের গান এমনই সুন্দর। তারাও কবিতা ভালবাসে—রামায়ণ শুনতে শুনতে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হায়! সৌন্দর্য্য উপভোগ অথবা জ্ঞান চর্চ্চার তাদের সময় কোথায়? যে সমাজ-ব্যবস্থা মনের দিক দিয়ে, দেহের দিক দিয়ে, তাদের এমন নিঃস্ব ক'রে রেখেছে তার পরিবর্ত্তন না হলে মানুষের দুঃখ ঘুচবার নয়। যত দিন দেশের একটি শিশুও দুধের অভাবে মাতৃকোলে কাঁদবে ততদিন প্রয়োজন নেই বিজ্ঞানের বহুবিধ সাজসরঞ্জামের। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত সেখানে সভ্যতার ঠাট বজায় রাখার জন্য নবদিল্লী রচনা করা ঘোরতর পাপ। যেখানে ভাত নেই সেখানে গীতার চেয়ে আগে প্রয়োজন ভাতের। A nation which makes steam engines before its little children have

enough milk to make their legs strong enough to carry them is making a fool's choice. * মানুষ যেখানে উপোসী সেখানে ভগবান একটি মাত্র মূর্ত্তিতে দেখা দেন। সে মূর্ত্তি অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। To a people famishing and idle, the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages। †

কিন্তু অতশত বিষয় ভেবেই বা লাভ :কি ? দুনিয়ার চাকা যে ভাবে ঘুরছে তেমনি ভাবে ঘুরলেই বা ক্ষতি কি ?

যেমন আছি তেমনি থাকলে লাভ হ'তো না ক্ষতি হ'তো জানি না। কিন্তু দুনিয়ার হালচাল কাল যা ছিল আজ তা নেই, আজ যা আছে কাল তা থাকবে না। চন্দ্র-সূর্য্যকে আকাশের ঠিক একটি যায়গায় যে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায় সে পাগল। দুনিয়ার কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হবে না, সব যেমন ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় থাকবে—এই ব্যবস্থা যে চায় তার জন্য মধ্যমনারায়ণ তেলের

* বার্ণাড্‌শ

† মহাত্মা গান্ধী

ব্যবস্থা করা উচিত। চন্দ্র সূর্য্য থেকে আরম্ভ করে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সকলের মাঝেই চলার সুর।

জাতির সম্পদ সৃষ্টি এবং বণ্টন করার উপায় আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়েও কত পরিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে। আগে মানুষ হাতে সূতা কাট্‌তো, হাতে কাপড় বুন্‌তো। এখন হাতের বদলে কলে কাপড় হয়, আর সেই কল চালায় বৈদ্যুতিক শক্তি। এক একটা কাপড়ের কলে ঘণ্টায় হাজার হাজার জোড়া কাপড় তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে। সম্পদ সৃষ্টির উপায় পূর্ব্বাপেক্ষা কত সহজ হয়েছে! কত অল্প সময়ের মধ্যে এখন আমরা কত বেশী জিনিষ তৈরী করবার কৌশল শিখে নিয়েছি! বাস্তবিক পক্ষে এই কল-কারখানার যুগে মানুষের পক্ষে দরিদ্র থাকবার কোনই কারণ নাই। সবাই যদি আমরা হাত লাগাই, কেউ বসে না থাকি—ঘরবাড়ী ভাত কাপড় এত অধিক পরিমাণে তৈরী হ'তে পারে যে কারও কোন অভাব থাকবে না। এখন যত ঘণ্টা ক'রে আমরা দিনে খাটি—এর অর্দ্ধেক সময় খাটলেই আমাদের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। বাকী অর্দ্ধেক সময় আমরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, আমোদ আহ্লাদের পিছনে ব্যয় ক'রতে পারি।

এই কল-কারখানা যন্ত্রপাতির যুগ আমাদের ঘাড়ের উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়েছে। একে ঠেকাবার সাধ্য কারও ছিল না। মহাকালের ইঙ্গিতে অজানার গর্ভ থেকে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসেছে ; আরও কত নব নব যন্ত্রপাতি ভবিষ্যতে আসবে—আমরা না চাইলেও আসবে। আমরা এই সব কল-কারখানাকে বহুজনের হিতের জন্য ব্যবহার করবার চেষ্টা করিনি ; সেই জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ এমন দরিদ্র। যে যুগে কল-কারখানা ছিল না সে যুগের লোকের চেয়েও এ যুগের লোক দরিদ্র। ধনীরা অতিমাত্রায় ধনী হ'য়ে উঠেছে। ক্ষুধিতের জন্য অন্ন, উলঙ্গের জন্য বস্ত্র এবং গৃহস্থের জন্য গৃহ তৈরী করার আজ সব চেয়ে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যাদের পরিশ্রম এই সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করবে তাদের দক্ষিণ বাহু আজ আলসে নবাবদের মোটরকার, রাইফেল আর তাদের গৃহিণীদের মুক্তার মালা ও হীরের দুল প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য সৃষ্টির পিছনে ব্যর্থ হচ্ছে।

রাজা রামচন্দ্রকে যদি বলা হতো—ভারতবর্ষে এমন অবস্থা আসবে যখন একজন অলস রাজা বা মহারাজার পাঁচ পাঁচটা প্রাসাদ থাকবে আর যারা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের একটা কুঁড়ে ঘরে পাঁচজন করে শুয়ে থাকতে

হ'বে তবে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, ভগবানের রাজ্যে এমন অবস্থা ঘটতেই পারে না। কিন্তু ভগবানকে তো আমরা শিকেয় তুলে রেখেছি। আমরা যে খুব খারাপ লোক বলে এমন উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। আমরা বড় উদাসীন লোক; আমাদের বোতাম-আঁটা জামার নীচে যে প্রাণটী আছে তা বড় পোষমানা। আমরা ভাবি, কাজ কি জাতির সম্পদ সৃষ্টি আর বণ্টনের উপায় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? যেমন চল্‌ছে, চল্‌তে দাও। আমাদের এই ঔদাসীন্যের ফলে আজ জাতির সম্পদকে যারা সৃষ্টি করছে তাদের চোখের জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে ধনীদের উদ্ধত সৌধরাজী।

সুতরাং এই ধারণা মাথা থেকে উৎপাটিত করে দাও যে, দুনিয়া যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই থেকে যাবে। তা হ'তেই পারে না। অবশ্য অলসভাবে ঘটনা-স্রোতের গতি নিরীক্ষণ করবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু সেখানে বিপদও কম নয়। এ তো নদীর পারে অলসভাবে বসে বসে স্রোতের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের মত নিরাপদ ব্যাপার নয়। পাগলা ঘোড়া গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে। সেই ঘোড়ার গাড়ীতে অলসভাবে ব'সে থাকার মত এ হচ্ছে বিপজ্জনক। যদি কিছু না

কর, যদি চুপ ক'রে উদাসীনের মত ব'সে থাক—তবে ধাক্কা খেয়ে মরতে হবে। আমাদের সমাজ আর রাষ্ট্রের অবস্থা হয়েছে ঐ গাড়ীর মত। ধনতন্ত্রের পাগলা ঘোড়াকে যদি সংযত করতে না পারি, গাড়ীকে যদি যথেচ্ছভাবে ছুটতে দিই সব ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাবে।

১৪

টাকা ভাগ ক'রে দেওয়ার উপায় সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে, কাজের অনুপাতে টাকা বেশী বা কম দেওয়া উচিত। এ কথার কোন মূল্য নেই। একটা কাজের পিছনে অনেকের পরিশ্রম থাকে। কে কতখানি কাজ করেছে তা ঠিক করা অসম্ভব। কোন কাজের মূল্য কতখানি তা বলাও মুস্কিল। ছুতোর জানালা গড়ে; কবি কবিতা লেখে। কবিতার মূল্য বেশী, না জানালার মূল্য বেশী? কেউ বলে, শ্রেণী অনুসারে আয়ের তারতম্য হওয়া উচিত। এ কথারও কোন মানে নেই। একজন হাকিমের দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যত খাবার পোষাকের দরকার, একজন কামারের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও ঠিক তত

খাবার পোষাকের দরকার। বরং একজন কামার একজন হাকিমের চেয়ে অনেক বেশী খেতে পারে। সুতরাং শ্রেণী অনুসারে আয়ের তারতম্যের কোন মানে নেই। ভদ্র-লোকদের আয় ছোটলোকদের চেয়ে বেশী হবে? জালি-য়ানওয়ালা বাগের জাঁদরেল সেনাপতি ডায়ার সাহেব ছিল ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন। সে নিরীহ শত শত মানুষ মেরে ছিল। সেই মানুষটা যা পেতো গ্রামের একজন শান্ত-প্রকৃতির সচ্চরিত্র কৃষক তার চেয়ে কম টাকা পাবে কেন? সে ছোটলোক ব'লে? ছোটলোক ভদ্রলোক গায়ে লেখা থাকে না। গুণ দেখে ভদ্র-ছোটর বিচার হওয়া উচিত। ব্যাপার মুস্কিল দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে কেউ কেউ বলে, দুনিয়ার চাকা যেমনভাবে ঘুরছে তেমনি ভাবেই ঘুরুক। কিন্তু এ হচ্ছে মূর্খের কথা, কারণ পরিবর্ত্তন পৃথিবীর নিয়ম। কোন কিছুই বরাবর ঠিক একভাবে চলতে পারে না।

তবে উপায়? ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন কি ঐক্য নাই? একটা জায়গায় সব দলের ঐক্য আছে; সবাই স্বীকার করে—দারিদ্র্যকে দেশ থেকে দূর ক'রে দেওয়া উচিত, কারণ "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী।" এবার দারিদ্র্য সম্পর্কে দুই-এক কথা বলার প্রয়োজন।

দরিদ্র হ'লেই যে সে দুঃখী হবে এর কোন মানে নেই। সুখ দুঃখ বাইরের জিনিষের ওপর নির্ভর করে না, ওটা প্রকৃতিগত। কুঁড়ে ঘরে থাকে এমন লোক রাজার চেয়ে অনেক সময় সুখী। টাকার সঙ্গে সুখ-দুঃখের সম্পর্ক নেই। অর্থ মানুষের ক্ষুধা দূর করতে পারে, মনের অশান্তি দূর করতে পারে না। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার নর নারী রয়েছে; তাদের না আছে পেটে ভাত, না আছে চালে খড়। ছেলেমেয়েগুলো দিগম্বর হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তবু তারা বেশ আছে। আফিংখোরের মত বেশ আছে। বেশ যদি না থাকতো তবে তো তারা নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠ্‌তো। গোমস্তার জুতো খেয়ে বাঁশ ঝাড় আর আশশ্যাওড়া বনের মধ্যে এই যে তারা কুকুর-শেয়ালের জীবন দিনের পর দিন শান্ত ভাবে বহন ক'রে চলেছে—এই সর্ব্বনেশে শান্তিই ত' তাদের কাল। শান্তি বড় কথা নয়। মাতাল মদ খেয়ে আরামে প'ড়ে থাকে, যে মদ খায় না তার চেয়ে সে সুখী। মানুষ দুঃখ অশান্তি ভুলবার জন্যই তাই মদ খায়। আফিমের নেশার মধ্যে আনন্দ আছে, কিন্তু শরীর ও মনকে নষ্ট ক'রে সেই আনন্দ আসে। সুখ বড়

কথা নয়, আ॰াম বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে খাঁটি মানুষ হওয়া, যা সত্য তারই অনুসরণ করা। পৃথিবীতে যতদিন একদল মানুষ আর একদল মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তাদের পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, সমাজ ও রাষ্ট্র যত দিন মিথ্যা, জুয়াচুরি এবং পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন সত্যিকারের মানুষ কেমন ক'রে শান্তি পাবে ? দারিদ্র্যকে আমরা তাড়াতে চাই কেন ? দারিদ্র্য মানুষকে অসুখী করে বলে ? মোটেই নয়। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ অশান্তির মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছেন। লুথার বলতেন—I am utterly weary of life ; rather than forty years more I would give up my chance of paradise. গেটে বলে-ছিলেন, During the whole of my seventy five years I have not had four weeks of genuine well being. পঁচাত্তর বছরের মধ্যে চারঘণ্টাও খুব শান্তিতে কাটাইনি। দারিদ্র্য মানুষকে অসুখী করে—এই জন্যই দারিদ্র্য যে ঘৃণার বস্তু, তা সত্য নয়। দারিদ্র্য আমাদিগকে হীন করে, দারিদ্র্য দস্যুর মত আমাদের পৌরুষ আর মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়—এই জন্যই দারিদ্র্যের উপর ক্রোধ। এই হীনতার মধ্যে যারা

শান্তিতে থাকে তাদের আত্মার দুর্গতির আর সীমা নেই'। এক রকমের দারিদ্র্য আছে যা নীরব বৈরাগ্যের দ্বারা সমুজ্জ্বল। চৈতন্য, খৃষ্ট, বুদ্ধ, দারিদ্র্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সে দারিদ্র্য আর আমরা চারিপাশে যে দারিদ্র্য দেখতে পাই এই দুয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। যে দারিদ্র্য আমরা বড় বড় সহরে দেখতে পাই তা মানুষকে অমানুষ করে এবং বিষাক্ত নিঃশ্বাসে চারিদিকের আবহাওয়াকে দূষিত ক'রে তোলে।

দরিদ্র নারী অর্থের জন্য কুপথের পথিক হয়। সে কি শুধু তার নিজেরই সর্ব্বনাশ করে? ধনীর ছেলেদের রক্তের মধ্যে সে বিষ ছড়িয়ে দেয়। এই ছেলেরা যখন বিয়ে করে তখন সেই বিষ স্ত্রী-কন্যার মধ্যেও প্রবেশ করে; বিষের ফলে ছেলে মেয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, অন্ধ হয়ে যায়;—বেশী দিন বাঁচে না। সহরের যে প্রান্তে গরীবেরা থাকে সেই প্রান্তে যখন মহামারী লাগে তখন কি ধনীদের পল্লী রক্ষা পায়? দারিদ্র্য বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিষ। এর ছোঁয়া সমাজের সবাইকে লাগে। গরীবের ছেলে ভাল শিক্ষার অভাবে যখন কুপথে যায়, কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করে তখন ধনীর ছেলেরাও সেই সব কথা এবং সেই সব আচরণ শেখে

সুতরাং সমাজে যতদিন দরিদ্র থাকবে ততদিন কেউ নিরাপদ নয়।

গরীব লোকের সম্বন্ধে অনেকে বলে থাকে, যেমন কুড়ে, তেমনি শাস্তি! কুঁড়েমি যেমন করেছিলে, এখন দারিদ্র্যের অভিশাপ কুড়িয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর! এ কথার পিছনে কিন্তু জ্ঞান নেই। কুঁড়েই হোক আর পরিশ্রমীই হোক, মাতালই হোক আর সংযমীই হোক, জ্ঞানীই হোক আর নির্ব্বোধই হোক, পাপীই হোক আর পুণ্যবানই হোক—দরিদ্র বলে সমাজে কেউ থাকবে না। থাক্‌লে সকলেরই ক্ষতি। মানুষ কষ্ট ভোগ করে, অন্য রকম কষ্ট ভোগ করুক। দারিদ্র্যের দুঃখ আমরা কাউকে ভোগ করতে দেবো না। কারণ দারিদ্র্য দরিদ্রের যত ক্ষতি করে তার দ্বিগুণ ক্ষতি এনে দেয় নিরীহ প্রতিবেশীদের ঘরে। It is a public nuisance as well as a private misfortune. Its toleration is a national crime.

মেনে নেওয়া গেল, সমাজে গরীব লোক থাকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ধনী লোক থাকতে দেওয়া হবে তো? দারিদ্র্য যখন লোপ পাবে তখন বিলাসিতা এবং অত্যধিক ব্যয়ের আমরা প্রশ্রয় দেবো কি না। এ বড়

কঠিন প্রশ্ন ; কারণ দারিদ্র্য কি তা বোঝা যায় ; বিলাসিতার মাপকাঠি নির্ণয় করা কঠিন। যখন কোন মেয়ে ক্ষুধায় কষ্ট পায়, ছেঁড়া কাপড় পরে, নিজের শোবার জন্য কোন ঘর তার না থাকে তখন বুঝতে হবে সে দরিদ্র। যখন কোন জেলায় শিশু-মৃত্যুর হার অত্যধিক হয়, বয়স পঞ্চাশ না হ'তে বয়স্ক লোকেরা মরে যায়, শিশুদের ওজন সযত্নে পালিত শিশুদের ওজনের তুলনায় হ্রাস পায়, তখন বুঝতে হবে ঐ জেলা দারিদ্র্যপীড়িত। ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও পীড়ন আছে। সম্পত্তি রক্ষার জন্য মামলা-মোকর্দ্দমা, গরীব আত্মীয়-স্বজন, দাস দাসী, অসুখ-বিসুখ—বড় লোকের দুর্ভাবনাও কি কম ? তার উপর সমাজে কেমন ক'রে নিজের অবস্থানুযায়ী মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সে চিন্তা ত আছেই ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজে যদি গরীব লোক আমরা না থাকতে দিই, সবাই যদি অবস্থাপন্ন লোক হয়, তবে গরীব আর বড়লোক এই দুই শ্রেণীর কথা উঠতে পারে না। সমাজে তা'হলে দু রকম লোক থাকবে। একদল লোক থাকবে যাদের কোন অভাব থাকবে না ; আর এক দল লোক থাকবে যাদের অভাব মিটে গিয়েও হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, কি হ'লে

একজন মানুষ নিজের অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে করতে পারে।

এর উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। একজন বেদের মেয়ে ছেঁড়া ঘাঘ্‌রা, তাঁবু আর ভাতের সঙ্গে কিছু ইঁদুরের মাংস জুটলেই মনে করে—দিনটা বেশ গেলো ; একজন রাজার মেয়ে দু'দশহাজার টাকার গয়না আর মোটরকার না থাকলে মনে করে, জীবনটা ব্যর্থ হোলো। আমাদের ঠাকুমা, পিসিমার দল রেড়ীর আলোতেই কাজ চালিয়েছে, কাঠের উনুনে রান্না করেছে। আমাদের এখনকার মেয়েদের ইলেকট্রিক লাইট, প্রাইমাস ষ্টোভ আর টেলিফোন না হ'লে চলে না। এগুলো আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কার পক্ষে কত টাকার প্রয়োজন একথা বলা অসম্ভব। একজন সাঁওতাল নেংটী প'রে, মহুয়া খেয়ে আর বাঁশী বাজিয়ে মনে করে, বেশ আছি। তোমার আমার ঘরে একটা হারমোনিয়াম অথবা এস্‌রাজ চাই ; দেওয়ালে দু'দশখানা ভালো ছবি না থাকলে ঘর কেমন ফাঁকা লাগে ; তাছাড়া ভালো ভালো দু'দশখানা বই রাখারও একান্ত প্রয়োজন অনুভব করি ; নইলে মনে হয়, সভ্য জগত থেকে পিছিয়ে আছি। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জিনিষ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে.

তার জায়গায় আসছে নূতন নূতন জিনিষ, নূতন নূতন আবিষ্কার। একদিন সাইকেল চড়তে পারাটাই ছিল পরম সৌভাগ্যের কথা ; এখন মোটর যখন তখন চড়ি ; এরোপ্লেনে না চড়াটা এখন দুর্ভাগ্য ব'লে মনে হয়। আমরা সর্ব্বদাই পুরাতন ছেড়ে নূতন নূতন জিনিষ চাচ্ছি। আমাদের যা আছে তার প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলছি ; চাইছি যা আমাদের নেই। এই নূতনের অভাব বোধ যদি দারিদ্র্যের লক্ষণ হয় তবে আমাদের দারিদ্র্য কোন কালেই ঘুচবার নয়। কারণ, সভ্যতার সমস্ত উপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমরা কোন দিনই পাবো না ; একটা না একটা জিনিষের অভাব থেকেই যাবে। অতএব, কেউ যদি বলে টাকা এমন ভাবে বণ্টন কর যাতে এক দলের সমস্ত অভাব ঘুচে যায় এবং আর একদলের অভাব ঘুচেও টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সে কথা শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হবে। অভাব ঘুচবার নয়, অভাব ঘোচাতে গিয়ে সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যাবে অথচ কারও মন তৃপ্ত হবে না। কেউ বলবে না, এইখানেই আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আর দরকার নাই। সবাই চেঁচাবে—আরও চাই, আরও চাই।

এই জন্যই সাম্যবাদীর দল বলে, সবাইকে সমান

ভাবে টাকা ভাগ করে দাও, কাউকে কম কাউকে বেশী দিওনা। The first and last commandment of Socialism is thou shalt not have a greater or less income than thy neighbour......" এই সাম্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রয়েছে সেই সৌন্দর্য্য সকলের চোখে ধরা না পড়তে পারে, কিন্তু আয়ের বৈষম্য সমাজে যে সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করছে তা যে কোন হৃদয়বান লোকেই বুঝতে পারে। ধর্ম্মমন্দির, স্কুল কলেজ, খবরের কাগজ, বিবাহ, বিচারালয়—সব কিছুকেই আয়ের বৈষম্য কলুষিত করে তুলেছে! এসব কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করেছি।

১৫

সাম্যবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায় এ নিয়ে সাম্যবাদীদের নিজেদের মতের মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য আছে। এমন লোক অনেক আছে যারা মুখে নিজেদের সাম্যবাদী বলে জাহির করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যারা ক্ষমতাপ্রয়াসী ধনীদেরই সামিল। এদের মুখে সাম্যবাদ ভূতের মুখে রামনামের মত শোনায়। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নিজেকে

পাকা সাম্যবাদী বলে প্রচার করতেন। আজ ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ব্যবহার ধনীদেরই মত। লঙ্কায় যে যায় সেই নাকি রাবণ হয়; হাতে টাকা আর ক্ষমতা পেলে পাকা সাম্যবাদীরও অনেক সময় মাথা ঘুরে যায়!

সাম্যবাদ কি—সে সম্পর্কে আমাদের ঠিক ঠিক জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন আছে। অনেক ছেলেদের, এমন কি অনেক বুড়োদের সঙ্গে মিশে দেখেছি, সাম্যবাদ সম্পর্কে ঠিক ধারণা তাঁদের মনে নেই। কার্ল মার্কসের বড় বড় কথা শুনি; Dictatorship of the proletariat, workmen of the world unite, land to the tillers—ইত্যাদি অনেক বড় কথাই কানে আসে কিন্তু আসলে যখন তলিয়ে বুঝতে চাই তখন দেখি সবই ধোঁয়া। ধোঁয়া নিয়ে থাকলে চলবে না। সাম্যবাদের যুগ ঝড়ের বেগে আসছে। আমাদের কংগ্রেসের গতিও সেই দিকে। মহাত্মা গান্ধী বিলাতে Round Table Conference এ কংগ্রেসকে স্পষ্টই peasant organisation বা কৃষক-সঙ্ঘ বলে অভিহিত করেছেন। এমন কথাও তিনি বলেছেন, যদি দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে গোলমাল বাধে তবে তিনি কোটী কোটী ভাষাহীন জনসাধারণের স্বার্থের কাছে সব স্বার্থই বলি দেবেন— if

there was a genuine real clash he had no hesitation in saying on behalf of the Congress that the Congress would sacrifice every interest for the sake of the interests of those dumb millions.

আজ এই গণ-দেবতার জাগরণের দিনে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা ক'রে নিতে হবে—সাম্যবাদের আদর্শ কি। আদর্শ ঠিক থাকলে আমাদের কাজে উৎসাহ আসবে, আমরা ঠিক পথে চলতে পারবো, আমাদের কর্ম্ম নির্ম্মল হবে, স্বার্থের দ্বারা কলুষিত হ'য়ে উঠবে না। এই আদর্শ নিয়ে সাম্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে যে যথেষ্ট অনৈক্য আছে—একথা পূর্ব্বেই বলেছি। যদি বলা যায়, দেশের আয় সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা উচিত—জমিদার: কিষাণ, বৃদ্ধ শিশু, পাপী পুণ্যবান প্রত্যেকেরই সমান আয় হওয়া সমীচীন—তবে পাকা সাম্যবাদীকেও দেখেছি ঘাড় নাড়তে। প্রত্যেকের আয় সমান হবে—এত বড় আদর্শ সহসা মেনে নিতে অনেকেরই সংস্কারে বাধে। এই জন্য সাম্যবাদী বলে পরিচিত অথচ সাম্যবাদী নয় এমন অনেকের মুখেই শুনি equality of opportunityর কথা। তারা সমান

আয়ের বদলে বলে সমান সুবিধার কথা। কিন্তু আয় যদি সমান না হয় তবে সুবিধা সমান ক'রে দিয়ে লাভ কি ? আমি সাম্যবাদের গোড়ার কথা লিখছি। যদি পাঁচ বছরের ছেলের সামনে একটা কলম আর দুদিস্তে কাগজ রেখে বলা যায়, তোমাকে বই লেখার যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা দেওয়া গেল—তুমিও এই রকমের একটা বই লেখ তবে তাকে বিদ্রূপই করা হবে। আমি গরীব কেরাণী, পাঁচটা ছেলের বাবা। মাসে কোন রকমে সত্তর টাকা রোজগার করি। মেজো ছেলেটা মেডিকেল কালেজে পড়তে চায়। আত্মীয় স্বজন বলে, ছেলেটাকে পড়াও না কেন ? কলিকাতায় বাড়ীতে থেকে পড়ানর ত' যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ; মনে হয়, তারা আমায় বিদ্রূপ করছে। আমি সত্তর টাকার কেরাণী ; পঞ্চাশ টাকা যদি একটা ছেলের পিছনে খরচ করি তবে বাকী সকলকে কি জল আর হাওয়া খাইয়ে রাখবো ? মেডিকেল কলেজ আমার বাড়ীর গায়ে হতে পারে, আমার ছেলে খুব বুদ্ধিমান হ'তে পারে ; কিন্তু মাসিক আয় যদি আমার অন্ততঃ দুশো টাকা না হয় তবে হাজার সুবিধা থাকলেও আমি করবো কি ? এই জন্য বলি, আয় যতক্ষণ সকলের সমান না হচ্ছে ততক্ষণ সুবিধা সমান ক'রে দেওয়ার কথা

মানুষকে ঠকাবে মাত্র। ও কথার কোন দাম নেই! Socialism means equality of income and nothing else. The other things are only its conditions or its consequences.

আসল কথা, বন্ধু, সকলের আগে সকলের জন্য চাই ভাত, কাপড় আর ঘর। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য—এসবের কথা পরে। যতক্ষণ ভাত, কাপড়, ঘরের অভাবে মানুষ কষ্ট পাবে ততক্ষণ স্বর্গ টর্গ সব মিথ্যে। স্বামীজী বলতেন, আমার দেশের একটী কুকুরও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে ততক্ষণ আমার স্বর্গ নেই। পেটে ভাত না পড়লে দুনিয়া আঁধার দেখি; বেদান্তের কথা কানে যায় না। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে; কিন্তু দেহরক্ষার জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন তা যতক্ষণ সমানভাবে সবাই না পাচ্ছি ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য কল্পনায় থেকে যাবে। এই সিদ্ধান্তে যে কোন মানুষ যে কোন রাস্তায় পৌঁছেছে সেই সাম্যবাদী। এই কথা যে স্বীকার করে না, সব মানুষের সমানভাবে ভাত কাপড় ঘর পাওয়ার অধিকার যে অস্বীকার করে সে প্রকাণ্ড গলায় সাম্যবাদের মন্ত্র যতই প্রচার করুক, এমন কি যদি ফাঁসিকাঠে সে নিজেকে বলিও দেয়, তবুও সে সাম্যবাদী নয়।

আশা করি, সাম্যবাদের মর্ম্মকথা এতদিনে আমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। সাম্যবাদের অভিধানে 'দয়া' কথাটার কোন স্থান নেই। দয়া করার মধ্যে ফাঁকি আছে, আত্মপ্রতারণা আছে, মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে অশান্ত বিবেককে ঠাণ্ডা করবার হাস্যকর চেষ্টা আছে। সমাজে উপাসনায় যোগ দিতে যাচ্ছি; সঙ্গে ছোট ছেলেটা—গায়ে গরম জামা, পায়ে মোজা। রাস্তায় দেখি, আমার ছেলের মত একটা ছেলে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে; গায়ে ছেঁড়া কাপড়, শীতে থর থর ক'রে কাঁপছে, মনে করুণা জাগলো, ছোঁড়ার হাতে একটা সিকি দিলাম। মন বড় খুসী, জীবে দয়া করেছি: ভগবান আজ ভক্তের প্রার্থনা ভাল ক'রেই শুনবেন; বিধাতা কিন্তু অলক্ষ্যে হাসলেন। কত অল্প দিয়ে আমরা তাঁকে খুসী করবার চেষ্টা করি! একটা সিকি দিয়ে ছেলেটার আমি কতটুকু উপকার করলাম? নিজের মন একটু খুসী হ'ল বটে, কিন্তু ছেলেটার অবস্থার কতটুকু পরিবর্ত্তন হ'লো? নিজের ছেলেটাকে যদি শীতের ভোরে ছেঁড়া-কাপড়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে দেখতাম তবে তাকে একটা সিকি অথবা টাকা দান ক'রে কি খুসী হতাম? পরের ছেলেটার জায়গায় নিজের ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে ধীরভাবে যদি

'সমস্ত বিষয়টা দেখি তবে দেখবো, দয়া দিয়ে আমরা নিজেকে এবং পরকে ভুলাই মাত্র। যে অন্যের দয়া নেয় সে নিজেকে ছোট করে, হীন করে। যার কিছু নেই তাকে দয়া ক'রে হীন করবার আমাদের কি অধিকার আছে? আমি দাতা—দান ক'রে এই আত্মপ্রসাসদটুকু উপভোগ করা যায় বটে; কিন্তু এর মধ্যে দাক্ষিণ্যের অহঙ্কার ছাড়া কিছু নেই। আমরা সাম্যবাদী। 'দীন দেখিয়া দয়া কর'—ভবিষ্যতের 'শিশুশিক্ষা' থেকে আমরা এই কথাটি তুলে দেবো। সাম্যবাদ দৈন্য ও দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে; সংসারে আমরা কোন মানুষকেই দরিদ্র থাকতে দেবো না। মানুষ এখন যদি দিগম্বর হ'য়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাকে আমরা সোজা থানায় নিয়ে যাই। সাম্যবাদের যুগে দারিদ্র্য অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে—দরিদ্র মানুষকে ন্যাংটা মানুষের মত গ্রেপ্তার করা হবে। Under Socialism people would be prosecuted for being poor as they are now for being naked.

আমাদের অভিধানে 'দয়া' কথাটীর জায়গায় যে কথাটী বড় বড় অক্ষরে থাকবে তা হ'চ্ছে ন্যায়। দয়ার জায়গায় 'ন্যায়ের' মন্ত্রকে জীবনে স্বীকার ক'রে নিলে

সহজের ফাঁকিতে নিজেকে বা অন্যকে ভুলাবো না। তখন রাস্তার ঝাড়ুদার ছেলেটাকে চার আনা দিয়ে বিবেককে শান্ত করতে পারবো না; নিজের ছেলেটার জন্য যে সুখ, যে আনন্দ, যে জীবনের প্রাচুর্য্য কামনা করি, তার জন্যও সেই সুখ, সেই আনন্দ, সেই প্রাচুর্য্য কামনা করবো। শুধু কামনা ক'রেই তৃপ্তি পাবো না। সমাজের যে সর্ব্বনেশে ব্যবস্থার জন্য হাজার হাজার ছেলে মেয়ে দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত হ'য়ে যাচ্ছে সেই ব্যবস্থা বদলে দিয়ে জগতকে একটা নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য মন পাগল হ'য়ে উঠ্‌বে। দয়ার মধ্যে ফাঁকি আছে। করুণার নামে নিজের দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার সুযোগ পাওয়া যায়। ন্যায়—কঠোর; তাকে স্বীকার ক'রে নিলে অনেক কিছু দুঃখকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। অধিকাংশ লোক তাই ন্যায়কে এড়িয়ে দয়ার আশ্রয় নেয়। আমরা 'দয়ার' মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার কদর্য্যতা সকলের সামনে দেখাতে চাই। আমরা যে সমাজ গড়তে চাই সেই সমাজে একজনের ধনসম্পত্তি আর এক জনের চেয়ে বেশী হবে না, সকলের আয় সমান হবে। যেখানে সকলের আয় সমান সেখানে কে কার কাছে হাত পাতবে? রাস্‌কিনের ভাষায় তাই আমাদের

জীবনের মন্ত্র হবে justice; mercy নয়। এখন আসল কথা। 'সাম্যবাদ' 'সাম্যবাদ' ব'লে গগন বিদীর্ণ করলে সাম্যবাদের যুগ আসবে না! সাম্যবাদে বিশ্বাস করা, সাম্যবাদের যুগের সুমধুর স্বপ্ন দেখা—আর সাম্য-বাদকে জাতীয় জীবনে মূর্ত্ত ক'রে তোলা এক কথা নয়। বিশ্বাসের সঙ্গে চাই কর্ম্ম। যেখানে অধিকাংশ নরনারী সাম্যবাদে বিশ্বাস করে না সেখানে আমাদের বিশ্বাসকে লোকের কাছে সত্য করে তুলতে হ'লে চাই কর্ম্ম। Faith is proved by action.

সাম্যবাদকে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মূর্ত্তি দিতে হলে আমাদের কি করতে হবে? কেমন করে আমরা সব মানুষের আয়কে সমান করতে পারবো? আয় সকলের সমান হতে পারে না যতদিন জমি, খনি, কল কারখানার মালিক থাকবে মুষ্টিমেয় ধনীর দল। এই ধনীর দল টাকা আর জমির মালিক। কিন্তু শ্রমিকের পরিশ্রম না হলে জমিতে ফসল ফলাবে কে? কারখানায় কল চালাবে কে? ধনীরা তাই নিজের স্বার্থের জন্য নিঃস্ব হাজার হাজার নরনারীকে বেতন দিয়ে কাজে নিযুক্ত করে। পারিশ্রমিক এমন ভাবে দেয় যাতে শ্রমিকের দল কোন রকমে কায়-ক্লেশে বেঁচে থেকে বিয়ে করে এমন কতকগুলি হতভাগা

জীব সৃষ্টি করে যেতে পারে যারা পিতৃপুরুষের মত ধনীর ধনোৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হবে। কেন তারা ধনীদের গরু, ঘোড়া হতে স্বীকার করে? না করে উপায় নেই। যাদের জমী নাই, খনি নেই, কারখানা নাই. গরু বাছুর নেই, দুনিয়ার যারা সবহারা তারা পেটের দায়ে এসে ধনী-দের কাছে ডান হাত বিক্রয় করে। ধনীরা দেখে—কত কম মজুরি দিয়ে কত বেশী কাজ আদায় করা যেতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ধনীদের হাতে। যাতে ধনীরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিষয় ভোগ করে যেতে পারে তার জন্য বিচারালয় আছে, পুলিশ প্রহরী আছে, জেলখানা আছে। এ সব ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

সাম্যবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী। সাম্যবাদী বলে, জমি, কলকারখানা সব জাতীয় সম্পত্তি হওয়া উচিত। হওয়া যে উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার গ্রামে জমিদার আছে। ইচ্ছা করলে আমি আমার জমি থেকে সমস্ত প্রজা উৎখাত করে দিতে পারি। আমি যদি মনে করি, আমার জমীকে চিড়িয়াখানায় অথবা ফুলবাগানে পরিণত করবো—আমি প্রজাকে বলতে পারি, তুমি আমার জমী থেকে উঠে যাও। সেই প্রজা যদি নিঃসহায়া রমণী হয় এবং তার ক্রোড়ে সদ্যোজাত

শিশুসন্তান থাকে তবুও তাকে আমার হুকুম তামিল ক'রতে হবে। যে ব্যবস্থা মানুষকে জমীর উপরে এমন উৎকট প্রভুত্ব দান করে, তার অবসান কামনা করা নিতান্তই স্বাভাবিক৭ সাম্যবাদের যুগে যে পুলিশ প্রহরী থাকবে না তা নয়। কিন্তু সেই পুলিশের কাজ হবে, ধন যাতে ব্যক্তি-বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না পারে সেই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা।

কংগ্রেসেরও গতি সাম্যবাদের দিকে। বিগত ১৯শে নভেম্বর Federal Structure Committeeর সভায় মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন তা সাম্যবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলছেন, "নূতন দিল্লীর কথা আপনারা ভাবুন। নয়া দিল্লী গড়তে কোটী কোটী টাকা খরচ হয়েছে। ধরুন আমাদের ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে নয়া দিল্লীকে ভালো কাজে লাগান উচিত। আপনারা কল্পনা করুন, পুরাতন দিল্লীতে ভয়ানক কলেরা আর মহামারী লেগেছে; আমাদের প্রয়োজন গরীবের জন্য হাঁসপাতালের। আমরা কি ক'রব? আপনারা কি মনে করেন, নূতন নূতন হাঁসপাতাল গড়বার আমাদের অবস্থা হবে? ও সব আমরা ক'রব না। আমরা নূতন দিল্লীর বড় বড় অট্টালিকাগুলো দখল ক'রে নেব আর

সেখানে প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের রাখব। কারণ খুব সোজা। ঐ বড় বড় সৌধগুলির সঙ্গে দেশের কোটী কোটী মানুষের স্বার্থের বিরোধ র'য়েছে। ওগুলো তাদের জিনিষ নয়। ঐ প্রাসাদগুলোর সঙ্গে সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের, সার তেজ বাহাদুর সপ্রুর অথবা ভূপালের নবাব সাহেবের স্বার্থের যোগ থাকতে পারে কিন্তু যাদের রাত্রে শোবার ঘর পর্য্যন্ত নেই, এক টুকরা রুটী পর্য্যন্ত যারা খেতে পায় না, তাদের সঙ্গে ঐ অট্টালিকাগুলোর প্রাণের একেবারেই কোন যোগ নেই। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করে, নয়া দিল্লীর কোন সার্থকতা নেই তবে কারও স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অট্টালিকাগুলো বড়-লোকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। জাতীয় গবর্ণ-মেণ্ট সেগুলোকে সকলের কল্যাণের জন্য ব্যবহার ক'রবে। যাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য কোন টাকা দেওয়া হবে না। তাদের ক্ষতিপূরণ ক'রতে গেলেই গরীবের পকেটে হাত দিতে হবে; তা অসম্ভব।"

এখন কথা হচ্ছে, কেমন ক'রে সবহারাদের দল নয়া দিল্লীর সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলো জাতীয় সম্পদে পরিণত ক'রবে? হাজার হাজার বিঘা জমির যারা মালিক তারা সহজে নিজেদের জমির উপর নিঃস্ব গরীবের

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেবে না। পুলিশ প্রহরী, বিচারক, জেলার সব বড়লোকদের হাতে। কোটী কোটী নিঃস্ব নরনারীর অধিকার আস্‌বে কোন্ পথে? সকলের আয় সমান ক'রবাঁর পথ হচ্ছে আইন। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সকলের আয় সমান ক'রবার পক্ষে আন্দোলন করতে পারি কিন্তু যার পকেটে পাঁচশো টাকা আছে তার টাকাগুলো সহসা রাস্তায় কেড়ে নিয়ে নিঃস্বদের মধ্যে আমরা ভাগ ক'রে দিতে পারি না। আমার প্রতিবেশী জমিদার কোন কাজ করে না, ব'সে ব'সে খায়। আমি গিয়ে তার ঘাড়ে লাঠি বসিয়ে বলতে পারি না তোমাকে কাজ ক'রতেই হবে। তা হ'লে আমাকে রাঁচিতে চালান দেওয়া হবে। আইন আমি নিজের হাতে নিতে পারি না। The remedy must be legal remedy. কিন্তু এখানেও মুস্কিল। যাদের হাতে দেশের আইন-কানুন রচনা ক'রবার ক্ষমতা আছে তারা সবাই বড় লোক। তারা এমন আইন হ'তে দেবে না যার দ্বারা তাদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে। কি ক'রে নিরন্নের দাবীকে আমরা জয়ী ক'রে তুল্‌ব? সে উপায়টী হচ্ছে দেশের শাসনতন্ত্রকে দেশের কোটী কোটী অন্নহীন মানুষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

১৬

অনেকের ধারণা সাম্যবাদের যুগ যখন আসবে তখন দেশে নিয়ম-কানুন ব'লে কিছু থাকবে না। সবাই আপন আপন খেয়াল মত কাজ ক'রবে ; সর্ব্বপ্রকার ভব্যতার ও সভ্যতার বন্ধন থেকে মুক্ত ছোটলোকের দল দেশকে নরক ক'রে তুলবে। এমন লোকও অনেক আছে যাদের ধারণা, সাম্যবাদের যুগে মানুষ নবীন স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলবে, আইনের পর আইন তৈরী হ'য়ে মানুষকে যন্ত্রের সামিল ক'রে তুল্‌বে। এই উভয় ধরণেরই লোকের ধারণা ভ্রান্তিমূলক।

সাম্যের যুগ যখন আসবে তখন অনেক আইন যে উঠে যাবে সে বিষয় সন্দেহ নেই। এমন অনেক আইন আছে যার অস্তিত্বের জন্য দায়ী বর্ত্তমান অবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ফ্যাক্টরী-আইনগুলির কথা। এখন কারখানাগুলির মালিক কতকগুলি ধনী ব্যক্তি। তারা লাভের জন্য অস্বাস্থ্যকর ঘরে নরনারী বালক-বালিকাকে স্বেচ্ছামত খাটাতে কোন দ্বিধা করে না। তাদের সর্ব্বগ্রাসী লোভের গ্রাস থেকে দরিদ্র নরনারীকে রক্ষা ক'রবার জন্য ফ্যাক্টরী-আইনগুলির সৃষ্টি

হয়েছে। সমাজে ধনী-দরিদ্র যখন থাকবে না, একদল লোক যখন ক্ষুধার জ্বালায় আর-এক দল লোকের কাছে দক্ষিণ বাহু বিক্রয় ক'রতে আসবে না, তখন এই সব আইনেরও কোন প্রয়োজন হবে না; সেগুলি অনর্থক ব'লে বিবেচিত হবে।

তারপর বড়লোকদের ধনসম্পত্তি রক্ষা ক'রবার উদ্দেশ্যে যে পর্ব্বত প্রমাণ আইনের শৃঙ্খল রচিত হয়েছে সে আইনের জোরে একজন মানুষ হাজার বিঘা জমির মালিক এবং আর-একজন ভূসম্পত্তিবিহীন নিঃস্ব মজুর—সেই আইনও সাম্যের যুগে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। সাম্যের যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) ব'লে যখন কিছু থাকবে না তখন তাকে রক্ষা করবার জন্য ধনীরা যে সব আইনের বাঁধ তৈরী করেছে সেগুলিও স্বভাবতঃই লোপ পাবে।

কিন্তু এর আর-একটা দিকও আছে। সাম্যের যুগে কেবল আইন উঠে যাবে না; আইন তৈরীও হবে যে আইন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যথেষ্ট হস্তক্ষেপ ক'রবে—এত বেশী ক'রবে যা আমাদের আজ স্বপ্নেরও অগোচর। আমাদের পকেটে টাকা থাকলেই এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারি। যাকে দেখলে মনে

হয় এই জীবনে একটা দিনও মেহনৎ করেনি, এবং জীবনে খেটে খাওয়ার ইচ্ছা এর একেবারেই নেই তাকেই সবাই খাতির করে, তার সঙ্গে সবাই ভাগ্য বিনিময় ক'রতে চায়। প্রতিবেশীরা তাকে সেলাম দেয়, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে। সে যখন গ্রামের পাঠশালায় যায়, ছাত্রেরা উঠে নমস্কার জানায়—ছুতার এলে ব'সেই থাকে। মা যদি একটা অলস বড়লোক পাত্রের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান ক'রতে পারে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে; বাপ যদি ছেলেগুলোর ব'সে খাওয়ার মত আয়ের সংস্থান ক'রে যেতে পারে কৃতার্থ হ'য়ে যায়। That work is a curse is part of our religion; that it is a disgrace is the first article in our social code. আমাদের সামাজিক রীতির প্রথম কথা হচ্ছে—কাজ মানুষকে ছোট করে; কাজ যে অভিশাপ এটা আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার থেকে আলুর ধামা কাঁধে ক'রে নিয়ে আসতে পারে এমন বুকের পাটা খুব কম ভদ্রলোকেরই আছে; হাই ষ্ট্রীট্ দিয়ে দুধের কেঁড়ে হাতে ক'রে নিয়ে যাবেন এমন ভদ্রমহিলা দুর্ল্লভ বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য সাম্যের সূর্য্য উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের আলস্য অন্তর্হিত হবে এমন মনে ক'রবার কোন হেতু নেই। তখনও মানুষ আর-একজনকে দিয়ে যদি আলুর ধামা অথবা দুধের কেঁড়ে বইয়ে নিতে পারে সে সুযোগ সে নিশ্চয়ই ছাড়বে না। কিন্তু এটা ঠিক কথা, সাম্যের যুগে কায়িক পরিশ্রমের কাজ ক'রতে কেউ লজ্জা বোধ ক'রবে না; যে লোক অলস হ'য়ে থাকতে চাইবে, খেটে খেতে ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রবে, তাকে সবাই দেখবে ভবঘুরে আর বদ্‌মায়েসের মত। তাকে চোরের মত সবাই ঘৃণা করবে—কারণ সমাজের ভাণ্ডার থেকে সে চুরি ক'রে খাচ্ছে; সে সমাজকে কিছু দান ক'রছে না, কেবল গ্রহণ ক'রছে। The idler will be treated not only as a rogue and a vagabond but as an embezzler of national funds, the meanest sort of thief.

১৭

সাম্যবাদ সম্বন্ধে যাদের একেবারেই কোন ধারণা নেই অথবা ধারণা থাকলেও যারা স্বার্থের খাতিরে সাম্যের যুগকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, তারা প্রায়শঃ ব'লে থাকেন, সাম্যবাদীরা কয়লার খনির মত মাতৃজাতিকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত ক'রবে। বলা বাহুল্য, সাম্য-বাদীর চোখে নারী কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। নারীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কথা সাম্যবাদীর ধারণারও অতীত। রুশিয়াতে নরনারী যদি স্বামী-স্ত্রীর মত একত্র বাস ক'রতে চায়, বিবাহ ক'রে তাদের বাস ক'রতে হবে। পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ না হ'য়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করা অন্য দেশে সম্ভবপর হ'লেও রুশিয়াতে সম্ভবপর নয়।

এখানে বলা প্রয়োজনীয়, বিবাহ অনুষ্ঠানটি সাম্য-বাদের ঠিক অঙ্গ নয়। বিভিন্ন দেশে বিবাহের রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির। কোন দেশে স্ত্রী জীবিত থাকতে একটির অধিক বিবাহ করা আইনের চোখে নিষিদ্ধ—আবার কোন দেশে পুরুষ একই সময়ে বহু স্ত্রীর পতিত্ব লাভ ক'রতে পারে। কোথাও স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য ; কোথাও বা নরনারীর যত ইচ্ছা তালাক দেবার স্বাধীনতা আছে। সাক্ষাৎভাবে এ সবের সঙ্গে সাম্যবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সাম্যবাদের বড় কথা, আয় সকলের সমান হবে। শিশু অথবা অশীতি-বর্ষের বৃদ্ধ, এক পত্নী অথবা বহু পত্নীর স্বামী—সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র এই নিয়মের প্রয়োগ সম্ভবপর।

তবে এটা সত্যি, সাম্যের যুগ প্রবর্ত্তিত হ'লে মানুষের পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবন বেশ একটু বদলে যাবে। বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহিতা নারী আর দাসীর কোন পার্থক্য নেই। বিবাহের ফুলের মালা কালক্রমে ফাঁসির দড়ি হ'য়ে রমণীর দমবন্ধ ক'রে মারে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ব'লে নারীর আর কিছু থাকে না ; তাকে আজীবন বাস করতে হয় পুরুষের ছায়া হ'য়ে, প্রতিধ্বনি হ'য়ে। কুমারী নারী—সেও তার পিতৃগৃহে বন্দিনীর জীবন যাপন করে। অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে ভালবাসা যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে ততক্ষণ জীবনযাত্রার মধ্যে কোন গোলমাল থাকে না। কিন্তু উভয় পক্ষ যখন আপন আপন স্বতন্ত্র রুচি অনুসারে বাঁচতে চায়, যখন এক পক্ষের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা অপর পক্ষের কাছে দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে তখন গৃহের সুখ শান্তি কর্পূরের মত উবে যায়।

কিন্তু মেয়েদের পারিবারিক জীবন যদি এতই দুর্ব্বহ ব'লে মনে হয় তবে ইব্‌সেনের নাট্যে চিত্রিত 'নোরা হেলমারে'র মত তারা স্বামী অথবা পিতার গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যায় না কেন? দরজায় ত' তালা দেওয়া নেই; খোলা রাস্তাও প'ড়ে আছে। কিন্তু তবুও যে অনেক মেয়ে চোখের জলে ঘরকন্না করে, তার কারণ পারিবারিক জীবনের মোহ নয়, তার কারণ অনাহারের ভয়। গৃহপ্রাঙ্গণের বাহিরে মাথা গুঁজবার ছাদ নেই—অপরিচিত জগতে অনশন ওৎ পেতে ব'সে আছে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত। যদি রাতের বেলায় বাসস্থান এবং ক্ষুধার সময় অন্নের অভাব না হ'ত অনেক স্ত্রী, অনেক স্বামী, অনেক ছেলে, অনেক মেয়ে গৃহের গণ্ডী ছেড়ে যেতে একটু কুণ্ঠা বোধ ক'রত না।

সাম্যের যুগে জীবিকা-অর্জ্জনের পথ সকলের পক্ষেই প্রশস্ত হবে—যে খাটবে সেই খেতে পাবে। সুতরাং এখন যেমন অনাহারের ভয়ে অনেক অসুখী নরনারীকে ভিটা কামড়ে প'ড়ে থাকতে হয়, তখন অনিচ্ছায় দুঃখ ও অপমানকে মেনে নেবার কোন কারণ থাকবে না। নরনারী বালকবালিকা যার কাছেই গৃহ কারাগার হ'য়ে দাঁড়াবে সেই তখন গৃহপ্রাচীরের বাহিরে

বিপুল জগতে আপনার মুক্তি খুঁজে নেবে। এই অবস্থা ঘটলে অবশ্য প্রেমহীন অনেক দাম্পত্য বন্ধন ভেঙে যাবে—অসুখী অনেক পরিবার ছিন্নভিন্ন হ'য়ে পড়বে। কিন্তু আসলে লাভের অংশই হবে বেশী। বাবা যদি জানে, ছেলে মেয়েকে অযথা তাড়না অথবা স্নেহের নামে তাদের উপর অত্যাচার ক'রলে তারা নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে তবে বেশ একটু সংযত হ'য়ে তাঁকে চলতে হবে। পিতৃত্বের দাবী অবাধে খাটাতে তাঁরা একটু সঙ্কোচ বোধ ক'রবেন। ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে শাসনের ভাগটা ক'মে গিয়ে সোহাগের ভাগটা একটু বেশী ক'রে জুটবে। স্বামী-স্ত্রীকেও পরস্পর পরস্পরকে বেশ একটু সমীহ ক'রে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের জীবনই যতক্ষণ নিজের কাছে সুখী ব'লে মনে হবে ততক্ষণই পরিণয়ের সূত্র অটুট থাকবে। এই সহজ সত্যি কথাটা যখন দম্পতী বুঝতে পারবে ততক্ষণ নারীপুরুষ কেউ কারও উপর অত্যাচার ক'রতে সাহস পাবে না। সাম্যের যুগেও বিবাহ-বন্ধন যে ভাঙবে না এমন নয়। কিন্তু এখনকার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা যে তখন ক'মবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্বার্থবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে টিঁকে থাকবে না; সেই সম্পর্ক গ'ড়ে উঠ্‌বে প্রেমের উপর। সেই

প্রেম যেখানে থাকবে না সেখানে দাম্পত্যের বন্ধনও থাকবে না; প্রেমের নির্লজ্জ অভিনয় লুপ্ত হ'য়ে যাবে।

১৮

সাম্যের যুগে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কাজ কেমনভাবে চলবে এইবার সে সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা ক'রব। এ পর্য্যন্ত শিক্ষার নামে যা চ'লে এসেছে তা বাস্তবিকই আমাদের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হ'য়েছে কি না— ভেবে দেখবার বিষয়। নিজের নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা ত সকলেরই আছে। গুরুমশাইয়ের বেত্রাঘাত, বেলা দশটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকা, পরীক্ষার উদ্বেগ, সব জিনিষটা মিলে বিদ্যালয়কে কারাগারের মত ভীতিপ্রদ ক'রে তুলেছে। সরস্বতীর মন্দির যদি বধ্যমঞ্চের মত ভয়ের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তার অপেক্ষা আপশোষের কথা আর কি হতে পারে? গৃহস্থ যেমন গোরুবাছুরের উপদ্রব অনেক সময় সহ্য করতে না পেরে গোয়ালার কাছে তাদের

পোষাণী দেয় বাপমাও তেমনি অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের পাঠশালার খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ছেলেমেয়েদের কাছে পড়ার বিষয় চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলবার কোন ব্যবস্থা নেই। বস্তার মধ্যে যেমন ক'রে দোকানদার চাল ডাল ভ'রে দেয় মাষ্টার মশাই তেমনি ছাত্রের মগজের মধ্যে কতকগুলি বিদ্যা ঢুকিয়ে দেয়। ম্যালেরিয়ার রোগী যেমন ক'রে নাক টিপে কুইনিন খায়, ছাত্র তেমনি নিতান্ত অনিচ্ছায় ইতিহাস-ভূগোল-জ্যামিতির নিরস তত্ত্বগুলি গলাধঃকরণ করে। লেখাপড়া শেখানর নামে যদি জোর জুলুম না চ'লত, বই হাতে করার সঙ্গে সঙ্গে যদি পরীক্ষার বিভীষিকার কথা না জাগত তা হ'লে অনেক ছেলেই আনন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দ প'ড়ত, রবীন্দ্রনাথ প'ড়ত। কিন্তু পড়বার সঙ্গে যখনই একটা বাধ্যতার ভাব এসে পড়ে তখনই বই বাঘের মত ভয়ের বস্তু হ'য়ে পড়ে। এত যে ছেলে ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া আর কিছু পড়তে চায় না, 'প্যারালালোগ্রামে'র নামে আঁৎকে ওঠে—যেমন ক'রে জেলখানা দেখে চোর আঁৎকে ওঠে—তার কারণ অনুসন্ধান করতে বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

শিক্ষাদান খুব সহজ কাজ নয়। শিক্ষক হ'তে গেলে যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রয়োজন আছে। অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথগুলি যাদের কাছে বন্ধ, সকল দুয়ার থেকে ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে এসে ওরাই পরিশেষে সরস্বতীর মন্দির দুয়ারে আশ্রয় নেয়। শিক্ষকের কাজ গ্রহণ ক'রতে হয় বাধ্য হ'য়ে, অভাবের তাড়নায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য। বেতন কম, দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা, গৃহে আনন্দ নেই; ছাত্রছাত্রীগুলি অস্থির, দুরন্ত, পড়াশুনায় মন নেই, জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকায়, নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ ক'রে গল্প করে। মাষ্টার বেচারার ধৈর্য্য আর কতক্ষণ থাকে? ঘনঘন বেতের আশ্রয় নিতে হয়; ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগে। ইস্কুলের নামে ছেলেমেয়েদের গায়ে জ্বর আসে। পাঠশালা বন্দীশালা মনে হয়। কত না ছেলে গুরুমহাশয়ের বেত খেয়ে চিরজনমের মত মা সরস্বতীর মন্দির থেকে বিদায় নিয়েছে! এর জন্য এ কথা যেন না ভাবি যে গুরুমশাই বাস্তবিকই রাক্ষসের মত একটা ভয়ঙ্কর জীব—তার চরিত্রে ভালবাসা অথবা করুণার কোন স্থান নেই। স্বামীস্ত্রীকে একটা ঘরের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস ক'রতে হ'লে তাদের মধ্যেও কলহের অন্ত

থাকে না। মানুষের স্বভাব সঙ্কীর্ণতার মধ্যে অনবরত একত্র বসবাস সহ্য করতে পারে না। বর্ত্তমানে যে অবস্থার মধ্যে শিক্ষককে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে হয় সে অবস্থায় সে বেচারা যদি ধৈর্য্য হারিয়ে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই।

সাম্যের যুগে এই শ্রেণীর শিক্ষক থা'কবে না। শিক্ষাদানের কাজ সম্মানের কাজ ব'লে বিবেচিত হবে। যাঁরা শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ ক'রবেন তাঁরা অর্থের জন্য বিদ্যাদান-কার্য্যে ব্রতী হবেন না। অর্থোপার্জ্জন তাঁদের কাছে গৌণ হবে। মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানের পথে জগৎকে আগিয়ে দেওয়া, ছাত্রের আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করা।

তারপর সাম্যের যুগে রাষ্ট্র কেবল ছাত্রের দেহকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবে না, তার আত্মাকেও কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকবে। ইস্কুলে ধর্ম্মশিক্ষার নামে ছেলেমেয়েদের মাথায় যাতে কোন অন্ধ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্য রাষ্ট্র সর্ব্বদা সজাগ থাকবে। মা কালির সম্মুখে নিরীহ ছাগশিশু বলি দেওয়া ধর্ম্মের কাজ—যারা এ-জগতে পাপ করে পর-জগতে তাদের জন্য ভগবান অনন্ত নরক

ব্যবস্থ ক'রে রেখেছেন, ইহ-জীবনে দারিদ্র্য অনশন প্রভৃতি যত কাযই আসুক না কেন তা নির্ব্বিবাদে সহ্য করা উচিত, কারণ এ-জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং পারলৌকিক জীবন চিরন্তন, এ-জীবনে অত্যাচার অবিচার যারা নিঃশব্দে বহন করে পরকালে তারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী—এই সমস্ত মিথ্যা উপদেশ যাতে ইস্কুলের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীর মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রবার কোন সুযোগ না পায় রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখবে।

ধনতন্ত্রের উপর যে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি, তার শিক্ষালয়-গুলির সর্ব্বদা লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ লোককে নিরীহ ক্রীতদাস ক'রে তোলা, যাতে তারা বিনা বাধায় কম পারি-শ্রমিকে ধনীর স্বার্থের জন্য ধনোৎপাদনে সাহায্য করে। সাম্যবাদের যুগে বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হবে মানুষকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা, তার জীবনকে সাম্যের আদর্শে গ'ড়ে তোলা। সমাজ টিঁকে আছে নীতির কতকগুলি সাধারণ নিয়মকে আশ্রয় ক'রে। কতকগুলি ব্যক্তি নিয়ে সমাজের সৃষ্টি। কোন্ কোন্ কর্ম্ম ভালো এবং কোন্ কোন্ কর্ম্ম মন্দ সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগুলির একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দেওয়া, ডাকাতি করা, মানুষ মেরে ফেলা, খারাপ কাজ এ-বিষয়ে

মতের অনৈক্য নেই। এই রকম সাধারণ সংস্কার অথবা ভালোমন্দের একটা সাধারণ মাপকাঠি আছে বলেই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। নইলে সাপের যেমন সমাজ নেই মানুষেরও তেমনি কোন সমাজ থাকত না।

এই সংস্কার অতি সহজেই মানুষের চিত্তে গাঁথা হয়ে যায় তার শৈশবে। ছেলেবেলায় মানুষের মনে যে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সেই বিশ্বাস বড় হলেও সে আর ছাড়তে পারে না। কোন বিশ্বাস যত কদর্য্যই হোক না যদি তা শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়—সেই বিশ্বাস পরিণামে তাদের সংস্কারে পরিণত হবে। বুড়ো হলেও সেই সংস্কার তাদের জীবনকে পরিচালিত করবে। আগেকার কালে মেয়েরা মনে করত পতির সঙ্গে চিতাশয্যায় সহমরণের মত এমন সৌভাগ্য নেই। শৈশবের সংস্কার তাদের এমন মনে করা'ত। এখনকার মেয়েরা তা মনে করে না, কারণ তাদের মনে এখন সেই সংস্কার জন্মে দেওয়া হয় না। আগে চীনের মেয়েদের কাছে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ছিল ছোট পা। সেই জন্য তারা ছেলেবেলা থেকে ছোট জুতা ব্যবহার ক'রে ক'রে আপনাদের পঙ্গু ক'রে ফে'লত। এ সংস্কারেরই

ফল। আমাদের দেশের মেয়েরা একে বর্ব্বরতার চিহ্ন মনে করে। এও সংস্কারেরই ফল।

এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে আমরা সমস্ত ঘৃণ্য সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছি। মানুষগুলো দলে দলে যুদ্ধে যায়—সুপ্তনগরীর উপর বোমা ফেলে নারী ও শিশু হত্যা করে, বড় বড় সহর কামানের গোলায় ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়, বেয়নেট দিয়ে মানুষের তাজা হৃৎপিণ্ড এ-ফোঁড় ও ফোঁড় ক'রে ফেলে। সিপাহীরা বিশ্বাস করে, এসব করা তাদের ধর্ম্ম। তারা আরও করে কারণ যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে মেয়েরা কাপুরুষ ব'লে তাদের উপহাস করবে। যুদ্ধে লোকমারা খারাপ কাজ নয় এই শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে ওরা পেয়ে এসেছে। তাই নরহত্যার অনুকূল লোকমত তৈরী করা এত সহজ, এবং সহজ বলেই সৈন্যবাহিনী গঠন করাও একেবারেই কঠিন নয়।

ইস্কুল কলেজ যখন সাম্যবাদীদের হাতে আসবে তখন ছেলেমেয়েদের চিত্তকে সাম্যের আদর্শে গ'ড়ে তুলবার বিপুল আয়োজন হবে। কারণ শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের চিত্ত যদি সাম্যের আদর্শে গ'ড়ে না ওঠে তবে সাম্যবাদের যুগ চিরকাল স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যেই থেকে যাবে। হাজার

হাজার নরনারী যেখানে অনাহারে রয়েছে সেখানে আমার জন্য চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয়ের ব্যবস্থা আছে ব'লে ভগবানকে আমরা ধন্যবাদ দেব না। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী যেমন ইচ্ছা ভাবতে পারে ; বেশী বাড়াবাড়ি হলে তাদের জন্যে রাঁচির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রাথমিক ইস্কুলে এমন শিক্ষা ছেলেমেয়েদের কোন মতেই দেওয়া হবে না যা সাম্যধর্ম্মের বিরোধী।

২৯

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাম্যবাদের যুগে ধর্ম্মের স:ঙ্গ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমনতর হবে। আমরা জানি, ইউরোপে রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম আপন আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কি ভীষণ সংগ্রামই না ক'রে এসেছে। পোপ চেয়েছে রাষ্ট্রকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে ; রাষ্ট্র চেয়েছে পোপকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে। কখনো জয়ী হয়েছে রাষ্ট্র ; কখনো জয়ী হয়েছে গীর্জ্জা। এই বিরোধের আজও শেষ হয়নি। মোল্লা পুরুত চাইবে ছেলেমেয়েদের মাথার মধ্যে নিজের নিজের ধর্ম্মমত ঢুকিয়ে দিতে ; রাষ্ট্র চাইবে ছেলেমেয়েদের মন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাম্যের

আদর্শে গড়তে। মনুসংহিতা বা কোরাণের আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রের আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—মুসলমান অথবা খৃষ্টান-শাস্ত্র মতে মৃতদেহ দাহ করা পাপ; শবদেহ মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। বিজ্ঞান বলে, বহুজনাকীর্ণ সহরে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলাই সমীচীন। সাম্যের যুগে যদি মিউনিসিপ্যালিটি নির্দ্দেশ দেয়, সহরের মৃতদেহ কবরস্থ না ক'রে পুড়িয়ে ফেলতে হবে তবে মোল্লা বা পুরুতের কথায় রাষ্ট্র কর্ণপাত করবে না। ইস্কুলে ছেলে মেয়েদের শেখানো হবে সহরের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলাই বিধেয়।

কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে যদি বলে, মানুষের মত জীব-জানোয়ারের আত্মা নেই, তাদের সৃষ্টি শুধু নরনারীর ভোগে লাগার জন্য এবং মানুষ তাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে—যেহেতু তাদের স্বতন্ত্র কোন অধিকার নেই—তবে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা যাতে বিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় না প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকবে।

অনেকের ধারণা, সাম্যবাদ ধর্ম্মের বিরোধী, সাম্যবাদীরা ধর্ম্মকে একটা কুসংস্কার ব'লে মনে করে। এই

ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তোমার ধর্ম্ম যদি তোমাকে বলে, ধনবৈষম্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তোমার ধর্ম্ম যদি উপদেশ দেয়, সকলের আয় কখনই শাস্ত্রানুসারে সমান হতে পারে না তবে অবশ্যই সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র তোমার ধর্ম্মকে সাগর জলে ভাসিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবে। তুমি যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে চলবার চেষ্টা কর, তবে রাষ্ট্র তোমার অবস্থাও কাহিল ক'রে তুলবে। কিন্তু তোমার ধর্ম্ম যদি, সকলের আয় সমান হওয়া উচিত, এই নীতির বিরোধী না হয় তবে স্বচ্ছন্দে তুমি ধর্ম্মাচরণ ক'রে সুখে জীবন যাপন করতে পার। রাষ্ট্র তোমার অথবা তোমার ধর্ম্মের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

উপসংহার

আসলে বড়লোক ও গরীব দুটো শ্রেণীই ঘৃণ্য। সেদিন পৃথিবী স্বর্গ হবে যেদিন দরিদ্র ব'লে কেউ থাকবে না। সকলের আর্থিক অবস্থা সমান হবে। "দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশি নাশী" "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এ সব কথার পিছনে প্রকাণ্ড সত্য লুকিয়ে আছে। আবার "Uneasy lies the head that wears a crown", "It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into the gates of heaven"—এই সব কথাও কম সত্য নয়। ভবিষ্যতের সমাজে কেউ কারও অপেক্ষা বড় লোক হবে না, গরীবও হবে না, অর্থের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য থাকবে না।

বর্ত্তমান সমাজ বৈষম্যকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। একের স্বার্থ অন্যের স্বার্থের প্রতিকূল। সকলেরই চেষ্টা— কেমন ক'রে বেশী টাকা করা যায়। উকীল মক্কেলকে প্রাণপণে শুষ্‌ছে, ক্রমাগত মোকদ্দমার দিন ফিরিয়ে দিচ্ছে, মামলা চালাবার জন্য মক্কেলকে উত্তেজিত করছে—উদ্দেশ্য টাকা। ডাক্তার রোগীকে দশ দিনে সারাচ্ছে যেখানে সে দুই দিনে রোগের উপশম করতে পারত। উদ্দেশ্য

মোটা ফী। দোকানদার জিনিষের দেড়া দাম হাঁকবে—উদ্দেশ্য মোটা লাভ। বাড়ীওয়ালা মোচড় দিয়ে যত বেশী পারে ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের চেষ্টায় আছে। লক্ষ্য মোটা ভাড়া। এমনি ক'রে সমাজের সর্ব্বত্র বিরোধের কোলাহল গর্জ্জে উঠ্‌ছে ফেনিল সমুদ্রের মত। জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘর্ষ এবং সেই স্বার্থ অর্থঘটিত। আমরা একজন মানুষকে মাসে পনের টাকা বেতন দেব আর-একজন মানুষকে মাসে একুশ হাজার টাকা বেতন দেব। তারপর দুজনকে বলব, তোমরা পরস্পরকে ভায়ের মত ভালোবাসো! এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কি হ'তে পারে?

আসলে আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই তাই আমরা বিশ্বাস করি। অধিকাংশ বিশ্বাসের মূলে যুক্তি নয়—মনের গোপন ইচ্ছা নিহিত থাকে। সমাজের ধুরন্ধর যাঁরা তারা আয়ের সমতায় বিশ্বাস করে না—তার কারণ, তারা বিশ্বাস করতে চায় না। বিশ্বাস করতে চায় না, কারণ আয়ের সমতায় বিশ্বাস করতে গেলে নিজের সার্থকে সঙ্কুচিত করতে হয়। আয়ের সমতা অসম্ভব—এই মতে বিশ্বাস করবার ফলে ডাক্তার, উকিল, জমিদার, মহাজন যদি আপন আপন স্বার্থের দিক

দিয়ে প্রচুর সুবিধা খুঁজে পায় তবে ঐ মতের অনুকূলে অনেক প্রমাণ তারা খুঁজে পাবেই। যে-কোন মত ডাক্তার, উকীল জমিদারের ঐশ্বর্য্যকে সমর্থন করবে সেই মতকেই তারা আঁকড়ে ধরবে। যে-কোন মত তাদের স্বার্থের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে সেই মতকেই বাতুলতা ব'লে তারা বর্জ্জন করবে।

এখন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা ব'লে তারাই পরিগণিত হয় যারা নিজের হাতে কোন কাজ করতে কুণ্ঠা বোধ করে, যারা সাধ্যমত অন্যকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয় অথচ অন্যকে কোন সেবা দান করে না। সাম্যের যুগে ভদ্রলোকের অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে। পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা যে-কোন নরনারীর আছে তারাই ভদ্রলোক বাচ্য হবার সুযোগ লাভ করবে। তখন ছোটলোক ব'লে পরিচিত হবে তারাই যারা দেশকে যা দান করে তার চেয়ে দেশের কাছ থেকে ঢের বেশী গ্রহণ করে। ভদ্রলোকের সম্মান পাবে তারা যারা দেশের কাছ থেকে যা গ্রহণ করবে তার চেয়ে দেশকে অনেক বেশী দান করবে। এই নূতন শ্রেণীর নরনারীই জাতিকে নূতন রূপ দান করবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সমাপ্ত